আশ্চর্য!

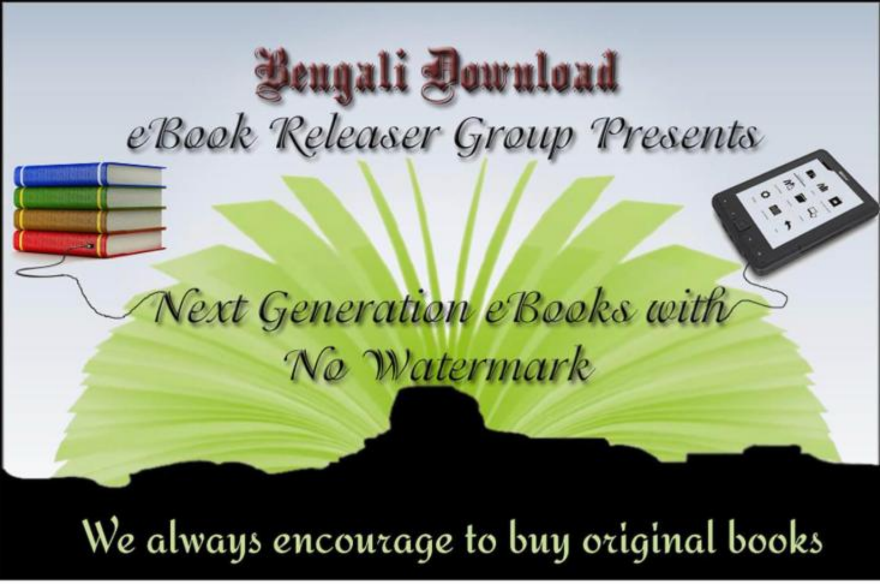
Bengali Download
eBook Releaser Group Presents
Next Generation eBooks with
No Watermark
We always encourage to buy original books

একটি অভিনব মাসিক পত্রিকা

আশ্চর্য!

মার্চ ১৯৬৭ ॥ ৫ম বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা

প্রধান উপদেষ্টা : প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ প্রধান পৃষ্ঠপোষক : সত্যজিৎ রায়

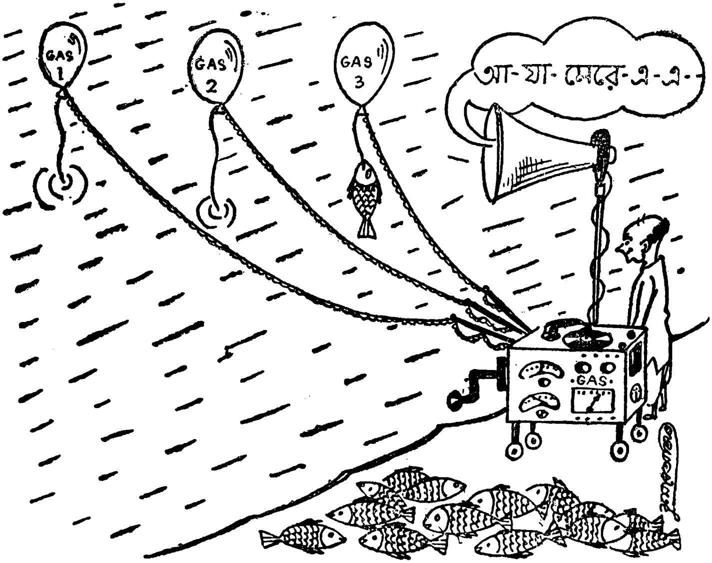

কম সময়ে কম খরচে বেশি মাছ ধরার বৈজ্ঞানিক কৌশল!

[কার্টুন : কুমার অজিত]

আশ্চর্য!

সম্পাদক : আকাশ সেন ॥ প্রকাশক : অসীম বর্ধন
অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌,
৭৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪

কালের সেরা কালি

ইজি ফ্লো

ফাউন্টেন পেনের কালি

সলভেন্ট "ই-১০০০ যুক্ত"

গ্রাম:- "হিজিনকো"
ফোন:- ২৪-৪৯৭৩

হিন্দুস্থান জেনারেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোং
৭৬, গনেশ চন্দ্র এভেনিউ • কলিকাতা • ১৩

জটিল জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দের পথ দেখাবে

সুখী মন

মাসিকপত্র

সগৌরবে তৃতীয় বর্ষ চলছে

জনপ্রিয় এই মাসিক পত্রিকাটিতে মানুষের মনের নানা সমস্যা ও প্রতিকার সম্পর্কে সহজ সরল আলোচনা নিয়মিত থাকে।

সম্পাদক : অসীম বর্ধন, এম. এড., এম. এ.

দাম মাত্র ৪০ পয়সা : বার্ষিক চাঁদা ৪৲ : ষাণ্মাসিক চাঁদা ২৲

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌

১৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

এ মাসের সূচী

ধারাবাহিক উপন্যাস :

উন্মাদ বৈজ্ঞানিক (জুল্‌স্ ভর্ণ) : অদ্রীশ বর্ধন ৮

গল্প :

প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য : সত্যজিৎ রায় ২২

ঘুম-ঘর : রণেন ঘোষ ৫৭

দেওয়ালের দরজা : অনাময় চট্টোপাধ্যায় ৭৩

২৫০১ সালে অসবর্ণ বিয়ে : অরুণাংশু ঘোষ ৮০

বেড়িয়ে এলেন গোকুলবাবু : অঞ্জন প্রকাশ সেনগুপ্ত ৮৩

সিনেমা :

জার্নি টু দি সেণ্টার অভ দি আর্থ (জুল্‌স্ ভর্ণ) : অদ্রীশ বর্ধন ১১৮
(একটি পুরো উপন্যাসের সারাংশ)

এস্ এফ সিনে ক্লাবের টুকরো খবর ১৩১

ফ্যানটাসটিক ভয়েজ ১৩৭

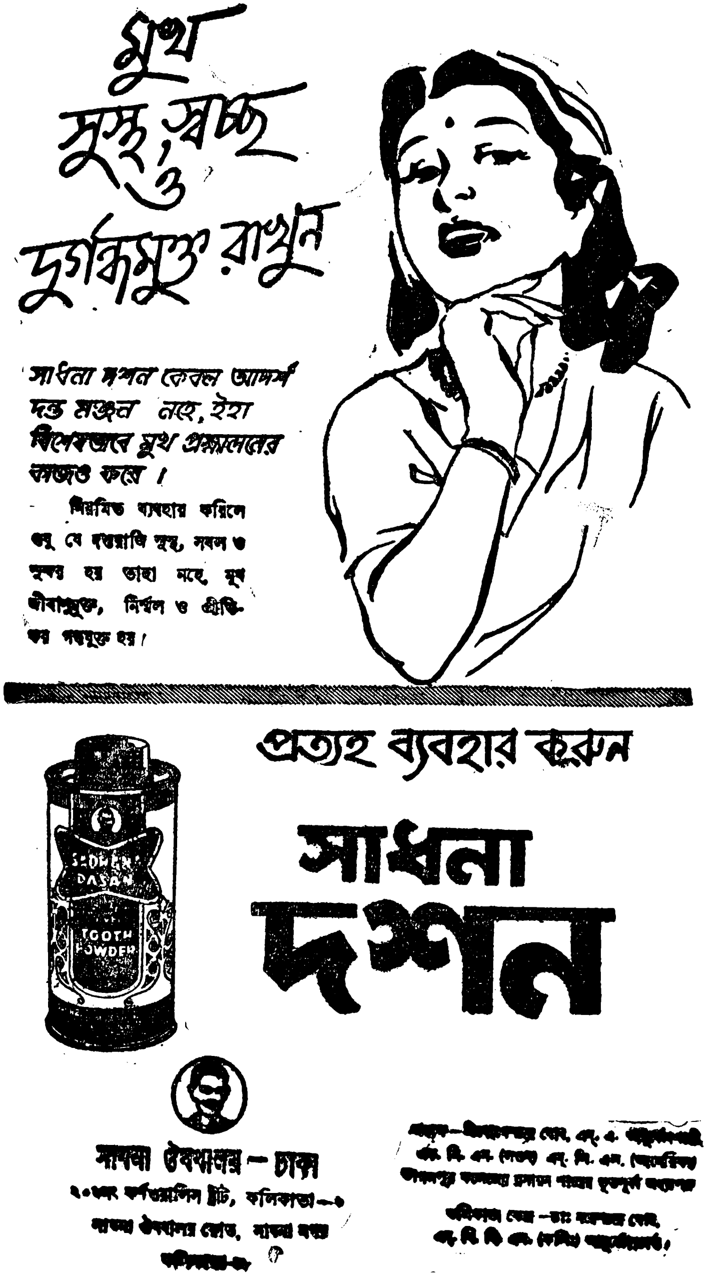

মুখ
সুস্থ, স্বচ্ছ ও
দুর্গন্ধমুক্ত রাখুন
সাধনা দশন কেবল আদর্শ দন্ত মঞ্জন নহে, ইহা বিশেষভাবে মুখ প্রক্ষালনের কাজও করে।
নিয়মিত ব্যবহার করিলে শুধু যে দন্তরাজি সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয় তাহা নহে, মুখ জীবাণুমুক্ত, নির্মল ও প্রীতিকর গন্ধযুক্ত হয়।
প্রত্যহ ব্যবহার করুন
সাধনা
দশন
SADHANA
DASAN
TOOTH
POWDER
সাধনা ঔষধালয় — ঢাকা
২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর

দ্বিবিধ উপকারী

কেশ তৈল

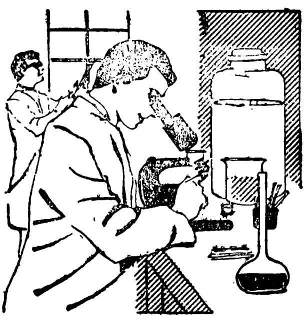

● মাথা ঠাণ্ডা রাখে
● স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্দ্ধনে সাহায্য করে

জীবনের বিভিন্ন বৃত্তিতে আজ নরনারী নির্বিশেষে সকলকেই মাথা ঘামাতে হয়। তাই তাঁদের পক্ষে এমন কেশ তৈলই বিশেষ উপযোগী যা একাধারে তাঁদের মাথা ঠাণ্ডা রাখবে এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্দ্ধনে সাহায্য করবে। আয়ুর্বেদীয় মতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত ভৃঙ্গরাজ লতা ও অন্যান্য গাছ-গাছড়ার ভেষজ গুণসম্পন্ন সেই অতুলনীয় কেশ তৈল হ'ল—

ক্যালকেমিকোর

ভৃঙ্গল

সুরভিত

মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত

CBF-1Ba1-66

বাঁচতে সবাই চায়

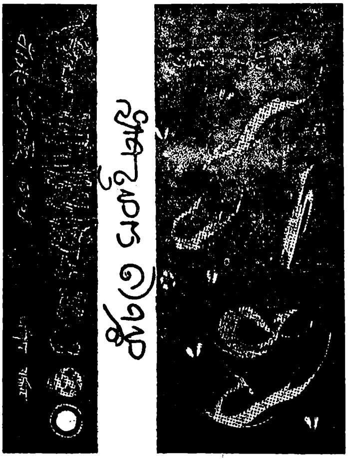

২য় সংস্করণ

অসীম বর্দ্ধন

জীবনের সার্থক পরিতৃপ্তি লাভের

ঘরোয়া আলোচনা

উচ্চ প্রশংসিত, ব্যাপকভাবে সমালোচিত

দাম ৩'৭৫

(ডাকব্যয় ৮১ পয়সা, ভিপি করা হয় না)

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস্

মনোরম গ্রন্থের প্রকাশক

পোস্ট বক্স ২৫০৭, কলিকাতা ১

৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

M&H TUSSANOL

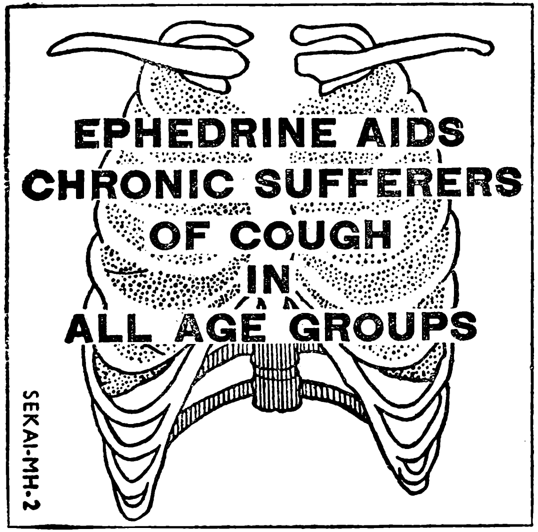

* গলার কষ্ট দূর করে
* শ্বাসনালীর কাজ সরল করে
* ঘন শ্লেষ্মা তরল করে
* শ্লেষ্মা বার করে দেয়
* শ্বাস প্রশ্বাস সহজ করে

MARTIN & HARRIS PRIVATE LTD.
CALCUTTA-1

উন্মাদ বৈজ্ঞানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

জুল্‌স্‌ ভর্নের "ফর দি ফ্ল্যাগ"

অনুবাদঃ অদ্রীশ বর্ধন

'ফ্যাবুলাস ওয়ার্ল্ড অভ জুল্‌স্‌ ভর্ন' নামক সিনেমায় রূপায়িত

ভূমিকা

জুল্‌স ভের্নের রচনাবলীতে সায়ান্স ফিকশ্যনের একটি প্রিয় বিষয় দেখা যায় না। অন্তত, আমি যদ্দুর জানি, বিপুল শক্তি সমূহের সঙ্গে প্রলয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভবিষ্যতের লড়াই'য়ের বর্ণনা তার কোন উপন্যাসেই নেই। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা মানবদরদী জুল্‌স ভের্ন ১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান লড়াইয়ে দেখেছিলেন সমসাময়িক যুদ্ধবিগ্রহের ভয়াবহতা কত চরমে পৌঁছোতে পারে। কাজেই দূরদৃষ্টি দিয়ে মহা-অস্ত্রের ব্যবহারে প্রলয়দৃশ্য কল্পনা করেও নিশ্চয় তিনি শিহরিত হয়েছিলেন।

এরকম বেশ কিছু হাতিয়ারের বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। তার মধ্যে অধিকাংশই সত্যি সত্যিই আধুনিক যুগে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু তাঁর গল্প-উপন্যাসে এজাতীয় অস্ত্রশস্ত্র কখনই রাজারাজরার হাতে দেখা যায়নি, দেখা গিয়েছে সাধারণ মানুষদের হাতে রাজ্য বা রাজত্বের সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্কই নেই। এরা হল দস্যুদল, বোম্বেটে, দাসব্যবসায়ী, নির্বাসিত রাজনীতিবিদ অথবা বিশ্বদ্বেষী, দুরাশয় অথবা অর্ধোন্মাদ বৈজ্ঞানিক। এই রকম দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছে 'ফর দি ফ্ল্যাগ' উপন্যাসে, যার ফলে কাহিনীটি শুধু সুখপাঠ্যই হয়নি, একটি অত্যুৎকৃষ্ট সায়ান্স ফিকশ্যন গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। তাই এই উপন্যাসের সমধিক প্রচার আশু প্রয়োজন।

উপন্যাসটি যতখানি চমকপ্রদ, বাস্তব জীবনে এর উপসংহারটুকুও ততখানি চমকপ্রদ। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক রসায়নবিদ ইউজিন টারপিনের অভিজ্ঞতাবলী জুল্‌স ভের্নকে বিলক্ষণ নাড়া দিয়েছিল এবং এ উপন্যাসের যাবতীয় উপাদান হয়তো তাই থেকেই তিনি আহরণ করেছেন। মন্দভাগ্য এই বৈজ্ঞানিক পিকরিক অ্যাসিড থেকে মেলিনাইট নামে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক আবিষ্কার করেছিলেন। মেলিনাইট অনেকটা পিক্রেট অফ পটাশ থেকে তৈরী বৃটিশ 'লিডাইট' এর মতই। বিস্ফোরকটা প্রত্যাখ্যান করল ফরাসী সরকার। ক্ষিপ্ত,

তিক্ত এবং প্রায় নিঃস্ব আবিষ্কারক তখন এমন জ্বালাময়ী ভাষায় সরকারকে আক্রমণ করে একটা কেতাব রচনা করলেন যে তৎক্ষণাৎ বইটাকে বাজেয়াপ্ত করল ফরাসী সরকার। 'ফর দি ফ্ল্যাগ' উপন্যাসে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে টমাস রোস-এর সংলাপে যে ধরনের বিষোদগার ফুলকি আর জ্বালা আছে, ইউজিন টারপিনের অধিকাংশ ভাষাতেও ছিল তাই।

উন্মাদের সঙ্গে তুলনীয় হলে কোন আবিষ্কারকই গদগদ হতে পারেন না। বেচারী টারপিনও এমন রেগে গেলেন যে এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভর্ণের বিরুদ্ধে চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার নালিশ রুজু করলেন আদালতে। ভর্ণের পক্ষে দাঁড়ালেন তাঁরই অন্যতম অনুরাগী, ধীমান তরুণ আইনবিদ রেমণ্ড পয়েনকেয়ার (ইনি পরে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী হন)। মামলায় জিতলেন ভর্ণ। টারপিন আরও চটে গেলেন। ভাবলেন, সারা দুনিয়া তাঁর পেছনে লেগেছে। তাই আপীল করলেন সুবিচারের আশায়। কিন্তু এবারও ধর্মাবতার রেহাই দিলেন জুল্‌স ভর্ণকে। টারপিনের মনের অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়।

তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের একটা বিস্ময় স্মরণ রাখা দরকার। এ বই যখন লেখা হয়েছিল, তখন সাবমেরিন বলতে মোটামুটি এক-রকম ডুবোজাহাজ তৈরী হত, আজকের তুলনায় সে সাবমেরিন ছিল অনেক অনুন্নত। এত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিরও বালাই ছিল না। এ রকম নির্ভরযোগ্যও ছিল না। কাজেই সাবমেরিন সম্পর্কে ভর্ণ যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যায় কি পরিমাণ আশ্চর্য দূরদৃষ্টি ছিল বিশ্ববিখ্যাত এই ফরাসী ঔপন্যাসিকের। এ ছাড়াও র‍্যাডার জাতীয় কিছুও তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। সমুদ্র যুদ্ধ খুব কাছে থেকেই হত, এত কাছে যে যোদ্ধারা পরস্পরকে দেখতে পেত। আধুনিক নৌযুদ্ধে এতখানি নৈকট্য আশাই করা যায় না।

অনেকেই বলেন, ভর্ণ বর্ণিত টমাস রোস-এর বিদ্যুৎ-বোমা পার-

মাণবিক বোমারই ভবিষ্যদবাণী। অবশ্য দুটো বোমার মধ্যে মিলও আছে প্রচুর। সুতরাং এ রকম ধারণা হওয়াটা খুবই যৌক্তিক। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু রেডিও অ্যাকটিভিটি সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না ভর্ণ। কেন না ১৮৯৬ সালে এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং সেই বছরেই ব্যাকুইরেল তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন। দৈবাৎ তিনি দেখতে পান ইউরেনিয়ামের উপস্থিতিতে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায় ফোটোগ্রাফিক প্লেট।

ভর্ণ যদি এ খবর জানতেন এবং এ আবিষ্কারের পরিণাম কল্পনায় আনতে পারতেন, তাহলে এই উপন্যাস তাঁর উল্লেখ থাকত। কেন না, প্রতিটি উপন্যাসে বাস্তব পটভূমিকা আঁকাই ছিল তাঁর চিরকেলে অভ্যাস। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভর্ণ একেবারেই নীরব। রোস-এর বিদ্যুৎ-বোমা সম্পর্কেও তিনি যা বর্ণনা দিয়েছেন তা বেশ অস্পষ্টই। পড়ে মনে হয় বিদ্যুৎ-বোমা আসলে স্বয়ংচালিত এমন একটা ক্ষেপণাস্ত্র, যার ক্ষমতা অপরিসীম। আজকাল যদিও এ অস্ত্র নেহাতই মামুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ১৮৯৬ সালে এ জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্রের কল্পনাও ছিল রীতি মত বিস্ময়কর। সম্ভবত, এ কাহিনী লেখবার সময়ে আগামী যুগের অস্ত্রশস্ত্রের রূপ কল্পনা করে তিনি অন্তরে শিউরে উঠেছিলেন। তাই পরবর্তী যুগে তাঁর মানসিক অস্বস্তি ও অশান্তির কারণটা হয়ত আমরা এই উপন্যাস পড়েই আঁচ করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হেল্‌থফুল হাউস

১৮৯০ সালের ১৫ই জুন একটা কার্ড এসে পৌঁছোলো হেল্‌থফুল হাউসের ডিরেক্টরের হাতে। কার্ডের ওপর বংশমর্যাদা বা আভিজাত্য সূচক কোনো প্রতীক চিহ্ন নেই—শুধু লেখা এই নামটি :

লা কোঁতো দ্য আর্টিগাস

সেই সঙ্গে পেন্সিলে লেখা কয়েকটি কথা : "স্কুনার 'এব্‌বা'তে আছি। নোঙর ফেলেছি পামলিকো সাউণ্ডের নিউবার্ণে।"

নর্থ ক্যারোলিনার নিউ বার্ণ Neuse নদীর মোহানার একদম শেষ প্রান্তে অবস্থিত। নদীটা এসে পড়েছে বিশাল লবণ-হ্রদ পামলিকো সাউণ্ডে। প্রাকৃতিক দ্বীপ আর দ্বীপপুঞ্জ দিয়ে সুরক্ষিত এই লবণ হ্রদে সাগরের মাতামাতি পৌঁছোতেই পারে না।

কার্ডের সঙ্গে একটা চিরকুট না থাকলে কার্ড পাঠানোর কারণটা হয়ত ডিরেক্টর মশায় অনুমানই করতে পারতেন না। চিরকুটে হেল্‌থফুল হাউস পরিদর্শনের অনুমতি চেয়েছেন কাউন্ট, ডিরেক্টর যে অনুমতি দেবেন, এ আশা তাঁর আছে। তাই সেই দিনই বিকেলে 'এব্‌বা'র কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন স্পেডকে নিয়ে তিনি আসছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ধনবান স্বাস্থ্যকামী পঙ্গুরা প্রায় আসেন বিখ্যাত এই প্রতিষ্ঠানে। সুতরাং অপরিচিত আগন্তুকরা এসে যে এহেন জায়গা দেখতে চাইবেন, তাতে আশ্চর্য কি! প্রস্তাবটা খুবই স্বাভাবিক। যাঁদের নামের গর্ব নেই, তাঁরাও আসেন, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যান। তাই রাজী হয়ে গেলেন ডিরেক্টর। জবাব দিলেন তক্ষুনি। লিখলেন, মহানুভব কাউন্টকে অভ্যর্থনা জানানোর সুযোগ পেলে তিনি নিজেকে সম্মানিতই মনে করবেন।

হেলথফুল হাউস দেখাশুনা করে বাছাই করা কর্মচারীরা। তদারকি করেন কয়েকজন অত্যন্ত প্রখ্যাত চিকিৎসক। হেলথফুল হাউস প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান। সম্পূর্ণ স্বাধীন এই প্রতিষ্ঠানে বাইরের জগতের

কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই—রাজ্য সরকারের প্রসঙ্গ অবশ্য স্বতন্ত্র। বিত্তমান রুগীরা আসেন এখানে। তাই তাঁদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সবরকম ব্যবস্থাই বিদ্যমান। লুপ্ত স্বাস্থ্যশ্রী ফিরিয়ে আনার আয়োজনে কোনো ত্রুটিই নেই।

এর চাইতে মনোমুগ্ধকর অঞ্চল খুঁজে বার করাও মুস্কিল। বাড়ীটা নির্মিত হয়েছে একটা পাহাড়ের ছায়ায়। বাড়ীর চারদিকে ছ'শ বিঘারও বেশী জমির ওপর সাজানো বাগান। সুন্দর সুন্দর গাছের সমারোহ সেখানে। বাগানের নীচের প্রান্ত থেকে, শুরু হয়েছে Neuse নদীর বিস্তৃত মোহানা। সেখানে অবিরাম বইছে পামলিকো সাউণ্ডের মৃদুমন্দ সমীরণ আর দূরস্থিত সমুদ্রের লোনাবাতাস।

এহেন অঞ্চলে রীতিমত স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেবাশুশ্রূষা করা হত হৃতস্বাস্থ্য কুবেরদের। রোগমুক্তির সংখ্যাও ছিল অসংখ্য। যদিও হেলথফুল হাউসে কেবলমাত্র পুরোনো রোগেরই চিকিৎসা হত, তাহলেও মানসিক ব্যাধি নিয়ে কোনো রুগী এলে ফিরিয়ে দেওয়া হত না। তার আগে অবশ্য দেখে নেওয়া হত অসুখটা একেবারেই দুরা-রোগ্য কিনা।

এ কাহিনীর শুরু যে সময়ে, তার আঠারো মাস আগে থেকেই এক ব্যক্তিকে বিশেষ নজরে আটক রাখা হয়েছিল এই ভবনে। মানুষটির কুখ্যাতি এতই সুদূরপ্রসারী যে বহু ব্যক্তি এমন কি কাউন্ট আর্টিগাসও আকৃষ্ট হয়েছেন এবং ছুটে এসেছেন হেলথফুল হাউসে শুধু তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে।

এই নামী পুরুষটি জাতিতে ফরাসী। নাম টমাস রোস। বয়স চল্লিশ। ভদ্রলোকের মানসিক ভারসাম্যের বাস্তবিকই অভাব ছিল এবং সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশই ছিল না। কিন্তু ডাক্তাররা তখনও তাঁকে পুরোপুরি পাগল বলে রায় দেননি। প্রাত্যহিক জীবনে ছোটখাট কাজগুলিও করতে পারতেন না টমাস রোস। এত অক্ষমতা সত্ত্বেও এক ব্যাপারে তাঁর যুক্তিবুদ্ধি কখনোই গুলিয়ে যেত না।

যখনই কোন প্রসঙ্গে জড়িয়ে পড়ত তাঁর ধীশক্তি, তাঁর মেধা, ঠিক তখনি দেখা যেত আশ্চর্যরকমের স্পৃহা, কাঁচের মত স্বচ্ছ, ইস্পাতের মত কঠোর অনমনীয় অজেয় তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর যুক্তিজাল। তাছাড়া, অপরিমেয় ধনশক্তি আর উন্মত্ততা যে প্রায় হাতে হাত মিলিয়ে চলে, তা কে না জানে বলুন। কিন্তু টমাস রোস এর-বিপুল ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে গেলেই শুরু হত প্রলাপবকা আর অসংলগ্ন আচরণ। তখন তিনি একেবারেই যুক্তিবুদ্ধিরহিত হয়ে যেতেন, ইতর প্রাণীর মধ্যেও যে সহজাত প্রবৃত্তি থাকে, তাও মুছে যেত তাঁর মধ্যে থেকে। নিজেকে আগলে রাখার কোন ক্ষমতাই আর থাকত না। এই সব মুহূর্তে শিশুর মত অসহায় অবাধ্য হয়ে যেতেন টমাস রোস। তখন আর তাঁকে চোখের আড়াল করা যেত না, যেমন করা যায় না অবুঝ শিশুকে। হেলথফুল হাউসের ১৭ নম্বর প্যাভিলিয়নে দিবারাত্র এই কারণেই তাঁকে চোখে চোখে রেখে দিত তাঁর রক্ষক।

সাধারণ পাগলামি যদি দুরারোগ্য না হয় তবে নৈতিক পদ্ধতি দিয়েই তা সারানো যায়। ওষুধপত্র যে নেহাতই অসার, তা অনেক আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। টমাস রোস এর ক্ষেত্রে কি তাহলে নৈতিক চিকিৎসা প্রযোজ্য ? খুবই সন্দেহ আছে তাতে। এমন কি শান্তির নীড় হেলথফুল হাউসের স্বাস্থ্যপ্রদ মনোরম পরিবেশেও এ চিকিৎসা কতখানি কার্যকর হবে, তা জোর করে বলা মুস্কিল। টমাস রোস-এর যে সব লক্ষণ, যেমন অস্থিরতা, ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন 'মুড, খিটখিটে মেজাজ, পাগলাটে স্বভাব, বিষাদভাব, বেদনাবোধহীনতা আমোদ-প্রমোদ অথবা গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের প্রতিবৈরাগ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্টভাবেই দেখা গিয়েছিল। সুতরাং ডাক্তারের ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ লক্ষণগুলোর তীব্রতা কমিয়ে দেওয়া অথবা রোগীকে সে সব থেকে পুরোপুরি মুক্তি দেওয়ার মত চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে পারেননি তাঁরা।

কথায় বলে, আধ্যাত্মিকতার বাড়াবাড়ি ঘটলেই উন্মত্ততা জিনিসটা

দেখা যায়। কথাটা ঠিক। এ অবস্থায় মন তার ভেতরের তৎপরতা নিয়েই এত বেশী বেহুঁশ হয়ে যায় যে আশপাশের ত্বনিয়ার কোনো ছাপই আর সেখানে পড়ে না। ঔদাসীন্যটা রোসের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছিল। উনি বেঁচে ছিলেন শুধু নিজের মনকে নিয়ে। তাঁর গোটা ত্বনিয়াটাই গড়ে উঠেছিল আপন মনের মধ্যে—বেঁচে ছিলেন একটি মাত্র বদ্ধমূল ধারণাকে আঁকড়ে ধরে। যে ধারণার শিকার হওয়ার ফলেই আজ তিনি উপনীত হয়েছেন এই অবস্থায়। জোরালো কোনো শক্ দিয়ে আবার তাঁকে বাস্তবতার মধ্যে ফিরিয়ে :আনা যেত কি? অভাবনীয় হলেই সম্ভাবনাটা একেবারেই অসম্ভব নয়।

আঠারো মাস আগে ওয়াশিংটনের নৌ-মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আবেদন জানিয়েছিলেন টমাস রোস। নৌ-মন্ত্রী যদিও জানতেন রোসের দাবীদাওয়া কি জাতীয় হবে তা সত্ত্বেও বিনাদ্বিধায় তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকারের আবেদন তিনি মঞ্জুর করেছিলেন। তা ছাড়া রোস তখন এমন কুখ্যাতি অর্জন করেছেন যে জাতির স্বার্থে আবেদন না-মঞ্জুর করতে পারলেন না মন্ত্রী মশায়।

টমাস রোস ছিলেন আবিষ্কারক। শুধু আবিষ্কারক নন, ধীমান আবিষ্কারক। নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে ইতিমধ্যেই সারা ত্বনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর নাম। আগে যা ছিল নিছক থিওরী, তাঁর দৌলতে সে-সবের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানী মহলে সুবিদিত ছিল তাঁর নাম। পণ্ডিত মহলে ছিল তাঁর প্রধান আসন। এ থেকেই অনুমান করে নেওয়া যায়, কি পরিমাণ লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, তাচ্ছিল্য মুখ বুঁজে সহ্য করে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ দেখা দিয়েছিল তাঁর মস্তিষ্কের গোলযোগ। সংযম দেখিয়েছিলেন প্রচুর, কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর অপরিসীম চাপের ফলে শেষ পর্যন্ত অন্তরীণ থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন হেলথফুল হাউসের ১৭ নম্বর প্যাভিলিয়নে।

টমাস রোসের সর্বশেষ আবিষ্কার একটি অবিশ্বাস্য শক্তিসম্পন্ন

ক্ষেপণাস্ত্র। নাম, রোস ফালগারেটর অর্থাৎ রোস-এর বিদ্যুৎবোমা। রোসের দাবী যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহলে এই ক্ষেপণাস্ত্র নাকি বিধ্বংসী ক্ষমতায় অন্যান্য সব অস্ত্রকেও ছাড়িয়ে যাবে। ফলে, এ অস্ত্র যে দেশের হাতে পড়বে, জল আর স্থলের ওপর অনায়াসেই একাধিপত্য বিস্তার করতে পারবে সে দেশের সরকার।

নিজেদের আবিষ্কার নিয়ে সব আবিষ্কারককেই ভয়ংকর সব অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে মন্ত্রীমশায়দের দিয়ে আবিষ্কারের মূল্য যাচাই করতে গেলে তো কালঘাম ছুটে যায়। কিন্তু অন্যান্য বহু পূর্বসূরীর মতই টমাস রোসের দাবী ছিল অত্যন্ত বেশী আবিষ্কারটার এমন মোটা দাম তিনি হেঁকে বসলেন যে তাঁর সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হওয়াটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল সবার পক্ষে।

তার একটা কারণও ছিল। এর আগেই টমাস রোসের বেশ কয়েকটি আবিষ্কারের বাহবা লুটেছেন অন্যান্য আবিষ্কারকরা। প্রতিটি আবিষ্কারে অসামান্য ফলাফল দেখা গিয়েছে, কিন্তু টমাস রোসের অদৃষ্টে জুটেছে কেবল ফাঁকি। ফলে, তাঁর মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। তিক্ততায় ভরে উঠেছিল সারা অন্তর। ন্যায্য আইনসঙ্গত পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বিছুটির জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছিল মনে। কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলেন, নিজের খুশীমত দাম না পেলে হাতিয়ারটা তিনি হাতছাড়া করবেন না। দামটা অপরের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা নিয়ে মোটেই চিন্তিত ছিলেন না তিনি। ফলে, বিশাল অংকের একটা টাকা তিনি চেয়ে বসলেন এবং দামটা দিতে হবে যন্ত্রমূল্যটা যাচাই করে দেখার আগেই। এ হেন পরিস্থিতিতে কেউই বিশ্বাস করতে পারলেন না তাঁর দাবীকে।

রোস জাতিতে ফরাসী। তাই ফালগারেটরটা প্রথমেই দিতে চেয়েছিলেন ফ্রান্সকে। স্বয়ংচালিত সেই হাতিয়ারের নক্সাটা সম্পূর্ণ মৌলিক। ভেতরে ঠাসা ছিল নতুন ধরনের বিস্ফোরক। বিস্ফো-

রকটা যাটতো যে স্ফোটক অর্থাৎ ডিটোনেটরের সাহায্যে, সেটাও সম্পূর্ণ নতুন এবং টমাস রোসের আবিষ্কার।

নিজে থেকেই উড়ে গিয়ে নাকি ফেটে যাবে সেটা, লক্ষ্যবস্তুতে আছড়ে পড়ারও দরকার হবে না। বেশ কয়েক শ গজ দূর থেকেও বিস্ফোরণ ঘটলে বায়ুমণ্ডলে এমন প্রলয়ংকর আলোড়নের সৃষ্টি হবে যে দশ হাজার বর্গগজের মধ্যে যাই থাকুক না কেন, সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেল্লা কি রণপোত কিছুই রক্ষে পাবে না। রোসের আবিষ্কার যদি সত্যিই এত শক্তিশালী হয়, তাহলে দেশ তো সুরক্ষিত থাকবেই, অপর দেশেও আক্রমণ হানার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু টমাস রোস বাড়িয়ে বলেন নি তো? নিজেরই আবিষ্কৃত কয়েকটা যন্ত্রপাতি দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষমতা তিনি অবশ্য যাচাই করেছিলেন, কিন্তু এক্সপেরিমেণ্ট না করলে ফারগারেটরের প্রকৃত শক্তি জানা তো সম্ভব নয়। এইখানেই যত আপত্তি টমাস রোসের। লক্ষ টাকা আগে না ধরে দিলে বিদ্যুত বোমার রহস্য তিনি হস্তান্তর তো করবেনই না, এক্সপেরিমেণ্টেরও কোনো আয়োজনও করবেন না।

রোসের মনের ভারসাম্য যে একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। মনের পুরোপুরি মালিক আর তিনি ছিলেন না, ধীশক্তির সর্বাঙ্গীন নিয়ন্ত্রণও গিয়েছিল আয়ত্তের বাইরে। এই অবস্থার ক্রমাগত অবনতি তো ঘটবেই এবং বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেতেও আর বেশী দেরী লাগবে না। মনের এরকম পরিস্থিতিতে টমাস রোসের সঙ্গে কোনোরকম রফার মধ্যেই আসতে পারে না পৃথিবীর কোনো গভর্ণমেণ্ট।

সুতরাং ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে বন্ধ করে দিতে হল যাবতীয় আলাপ আলোচনা। সংবাদপত্ররাও স্বীকার করতে বাধ্য হল যে এ অবস্থায় রসালোচনা চালানো রীতিমত কষ্টকর এবং ঝুঁকির ব্যাপার। এমন কি সাংঘাতিক বিরোধী কাগজগুলোও সুরে সুর মেলালো। খারিজ করে দেওয়া হল টমাস রোসের সব প্রস্তাব। অন্যান্য দেশ যে টমাস রোসে

আবিষ্কার লুফে নিতে পারে, এমন আশংকার ছায়াও দেখা দিল না কারোর মনে।

আধ্যাত্মিকতার এই বাড়াবাড়ির ফলে আবিষ্কারকের মন যখন টলমলে, তখন আতীব্র দেশপ্রেমও যে ধীরে ধীরে কমতে কমতে একেবারেই মিলিয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! মনের যে তন্ত্রীতে স্বদেশের প্রতি আনুগত্যের গভীর সুর রণিত হয়, আস্তে আস্তে থেমে এল সেই তন্ত্রীর কম্পন এবং এক সময়ে তা একেবারেই নীরব হয়ে গেল। মানুষের স্বভাবকে ছোট করা উচিত নয় বলেই একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। এই মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে কোনো কাজকর্ম অথবা সিদ্ধান্তের জন্য টমাস রোস আর দায়ী ছিলেন না, থাকতে পারেন না। কেবলমাত্র নিজের আবিষ্কারের প্রসঙ্গেই টনটনে বুদ্ধির পরিচয় দিতেন ভদ্রলোক। তাছাড়া নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে ছোটখাটো প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধেও তাঁর ঔদাসীন্য এবং তাঁর মানসিক বৈকল্য রোজই এমন প্রকট হয়ে উঠতে লাগল যে ক্রমে ক্রমে সব রকম দায়িত্বই মুছে যেতে লাগল তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে অর্থাৎ স্বীয় কর্মের জন্য আর দায়ী রইলেন না অসুস্থমস্তিষ্ক টমাস রোস।

সুতরাং বিনীতভাবেই আলোচনাচক্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। সেই সঙ্গে আরও একটা ব্যবস্থা করা হয়ত উচিৎ ছিল। টমাস রোস যাতে আবিষ্কারটা অন্য কোথাও না নিয়ে যেতে পারেন, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা করা হয় নি এবং ভুল হল সেইখানেই।

পরিণামে যা হবার তাই হল। ক্রমশই রাগ বাড়ছিল টমাস রোসের। ক্রোধবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হয়ে আসছিল দেশানুগত্যবোধ। কোনো মানুষই যে নিজের অধীন নয়, স্বদেশের অধীন—এই পরম বোধটি অসাড় হয়ে আসছিল চরম হতাশার মোচড়ের মধ্যে দিয়ে। তাই এবার অন্য দেশের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন টমাস রোস। পেরিয়ে গেলেন সীমান্ত, বিস্মৃত হলেন অবিস্মরণীয় অতীত—রোস ফালগারেটর হাজির

করলেন জার্মানীর সামনে।

আবিষ্কারকের বিপুল দর শুনে সে দেশের সরকারও স্রেফ না বলে দিল—কোনো কথাই আর শুনতে চাইল না। তা ছাড়া জার্মানী তখন নিজেদের স্বয়ংচালিত ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছিল। তাই কর্তৃপক্ষরা ভাবল, ফরাসী আবিষ্কার না কিনলেও তাদের চলে যাবে।

রাগে ফুঁসছিলেন রোস। এবার সে রাগ রূপান্তরিত হল প্রচণ্ড ঘৃণায়। ঘৃণা সমস্ত মানবজাতির প্রতি। আত্যন্তিক সেই ঘৃণা বিশেষ ভাবে উগ্র হয়ে উঠল বৃটিশ অ্যাডমিরালটির কাছে তাঁর প্রস্তাব পেল করার পর থেকেই। ইংরেজ জাতটা ব্যবহারিক বুদ্ধিতে বেশ পাকা। তাই রোসকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন না অ্যাডমিরালটি। বেশ কিছুদিন খেলালেন। দর কমানোর চেষ্টা করলেন। মেজাজ নরম করার চেষ্টা করলেন। এমন কি প্রতারণার চেষ্টাও করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বাজে কথার পাত্র নন টমাস রোস। তাঁর টাকা চাই। রোস ফালগারেটারের গুপ্ত রহস্যের দাম লাখ লাখ টাকা। সে টাকা হাতে না আসা পর্যন্ত রহস্য রহস্যই থেকে যাবে। কেউ জানতে পারবে না। শেষ কালে হাল ছেড়ে দিয়ে খেদিয়ে দিলেন অ্যাডমিরালটি।

এই রকম যখন পরিস্থিতি, যখন প্রতিদিনই শনৈ শনৈ অবনতি ঘটছে তাঁর মানসিক অবস্থার, তখন তিনি শেষ চেষ্টা করলেন আমেরিকায়—এই কাহিনী শুরু হওয়ার আঠারো মাস আগে।

মার্কিন জাতটা ইংরেজদের চাইতেও আর এক কাঠি ওপরে যায় বাস্তব বুদ্ধির দিক দিয়ে। টমাস রোসের নামডাকের দরুণ তাঁর আবিষ্কারের দাম যে কতখানি হওয়া উচিত তা তারা জানত। সুতরাং রোস ফালগারেটর নিয়ে খামোকা ছেলেখেলার ধার দিয়েও গেল না তারা। টমাস রোসকে প্রকৃত প্রতিভাবান মানুষ হিসেবেই স্বাগতম জানাল। তারপর তাঁর মনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন আয়োজন করতে লাগল যাতে পরে এক সময়ে মোটামুটি একটা দামে রাজী হয়ে

যান টমাস রোস।

কিন্তু ভদ্রলোক মানসিক বিপর্যয়ের এমন সব লক্ষণ দেখাতে শুরু করলেন যে তাঁর উন্মত্ততা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের আর নতুন কোনো প্রমাণের দরকার হল না। তাই তাঁর আবিষ্কারের স্বার্থেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন টমাস রোসকে সংযত পরিবেশে রাখা হোক।

উন্মাদ আশ্রমে না পাঠিয়ে তাঁকে রাখা হল হেলথফুল হাউসে। তাঁর যে ব্যাধি, তা সরিয়ে তোলার সবরকম সুবিধেই পাওয়া গেল সেখানে। চোখে চোখে রাখা হল টমাস রোসকে। সেবাশুশ্রূষার কোনো ত্রুটি না হলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হল না। কারণটা আর একবার বলে রাখা দরকার। যতই কাণ্ডজ্ঞানহীন হোন না কেন টমাস রোস, একটি বিষয়ে টনটনে ছিল তাঁর জ্ঞান এবং তা হল তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কিত যে কোনো প্রসঙ্গ। সেই মুহূর্তে আপনাতে আপনি ফিরে আসতেন টমাস রোস। ঘুম ভাঙ্গত তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্তার। ধীর স্থির কণ্ঠে এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলতেন যে তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রভুত্ব সবার মনেই দাগ কেটে যেত। বিদ্যুৎ বোমার বিস্ময়কর শক্তি সম্পার্কে কুশলী বাগ্মীর মত এমন বাক্য জাল রচনা করতেন যে তাজ্জব বনে যেত শ্রোতারা। ফালগারেটরের বিস্ফোরণের পর অসাধারণ ফলাফল সম্পার্কে তিলমাত্র সন্দেহ থাকত না।

কিন্তু বিস্ফোরকটার আর তার ডিটোনেটরের অর্থাৎ স্ফোটকের প্রকৃতি, ফরমূলা আর প্রস্তুত প্রণালীর প্রশ্ন উঠলেই বোবা হয়ে যেতেন টমাস রোস। তখন উধাও হত তাঁর বাগ্মীতা। হুঁশিয়ার হয়ে জবাব দিতেন, ওজন করে করে কথা বলতেন। দু' একবার আশার আলো দেখা গিয়েছিল। উন্মত্ততা চরমে ওঠার সময়ে মনে হয়েছিল প্রগলভ বৈজ্ঞানিক হয়ত এবার ফাঁস করে ফেলবেন আবিষ্কারের গুপ্ত রহস্য··· সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল আশপাশের সবাই—কিন্তু বৃথাই। নিজেকে আগলে রাখার সহজাত প্রবৃত্তি হারালেও আবিষ্কারের রহস্য আগলে রাখার মত হুঁশিয়ারি হারান নি টমাস রোস।

হেলথফুল হাউসের পার্কে সতেরো নম্বর প্যাভিলিয়নের চারদিকে ঘন ঝোপ। রক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাগানে যাতে ব্যায়াম করতে পারেন উন্মাদ বৈজ্ঞানিক, তাই এই ব্যবস্থা। একই প্যাভিলিয়নে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গেই থাকত এই রক্ষকটি, ঘুমোতো একই ঘরে, নজর রাখত দিবারাত্র এবং পুরো এক ঘণ্টার জন্যেও তাঁকে একলা রেখে যেত না।

সাধারণত ঘুম আর জাগরণের মধ্যবর্তী সময়েই যত কিছু প্রলাপ বকতেন টমাস রোস। এই সময়ে উৎকর্ণ হয়ে প্রতিটি কথা শুনত রক্ষক। এমন কি ঘুমিয়েও টমাস রোস বিড়বিড় করে বকলে তৎক্ষণাৎ কাণ খাড়া করত সে।

রক্ষকের নাম গেডন। হেলথফুল হাউসে বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কারক এসে পৌঁছোনোর পরেই এমন একজন লোকের দরকার হয়ে পড়েছিল যে গড়গড় করে ফরাসী বলতে পারে। দরখাস্ত পাঠায় গেডন। তারপরেই বহাল হয়ে যায় নতুন রুগীর রক্ষক হিসেবে।

এই গেডন লোকটা আসলে একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার। নাম সাইমন হার্ট। নিউ জার্সিতে এক রসায়ন প্রস্তুতকারকের ফ্যাক্টরীতে বেশ কয়েক বছর চাকরী করেছিলেন ভদ্রলোক। বয়স চল্লিশ বছর। চওড়া কপাল। ললাটে সরল রেখার আঁকিবুঁকি দেখলেই অনুমান করা যায় পর্যবেক্ষণ তাঁর কতখানি তীক্ষ্ণ। চোখ মুখের ভাব দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। মানসিক শক্তিতে ভরপূর মুখচ্ছবি। দেখলেই বোঝা যায় কোনো কাজ হাতে নিয়ে তা মাঝ পথে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র সাইমন হার্ট নন।

আধুনিক হাতিয়ারের উন্নতিকরণ সম্পর্কে বিবিধ সমস্যায় পণ্ডিত মানুষ ছিলেন এই সাইমন হার্ট। এ সম্পর্কে যাবতীয় আবিষ্কারও ছিল তাঁর নখদর্পণে। বিস্ফোরক সম্বন্ধে সে সময়ে নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা চলছিল এবং প্রায় এগার শ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। সাইমন হার্ট তার প্রতিটি জানতেন বলেই টমাস রোসকে এত শ্রদ্ধার

চোখে দেখতেন। ফালগারেটরের ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই সাইমন হার্টের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না যে টমাস রোস এমন এক মহা অস্ত্রের গুপ্তরহস্য আয়ত্ত করেছেন যার মহিমায় যুদ্ধবিদ্যায় বিপ্লব আসবে, স্থলে জলে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করা চলবে, সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

সাইমন হার্ট জানতেন, উন্মত্ততাও খাতির করে চলে বিজ্ঞানের এই প্রতিভূকে। তাই টমাস রোসের আংশিক বিকৃত মস্তিষ্কে এখনও কোথায় যেন জ্বলছে আলো, একটা দীপশিখা। সব নিভেছে, কিন্তু প্রতিভার এই শিখা এখনও নেভেনি। সাইমন হার্ট এমন আশংকাও করেছিলেন, ক্ষিপ্ত টমাস রোস যদি বিভ্রান্তির মুহূর্তে প্রলাপের মধ্যে ফাঁস করে দেন তাঁর আবিষ্কারের গোপনসূত্র, তাহলেই সে অস্ত্র নিয়োজিত হবে বিদেশী রাষ্ট্রের স্বার্থে। তাই মনস্থির করে ফেললেন ইঞ্জিনীয়ার হার্ট। ফরাসী-জানা আমেরিকান হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে আবিষ্কারকের রক্ষক হওয়াই শ্রেয় মনে করলেন তিনি। ইউরোপ পর্যটনের অছিলায় চাকরী ছেড়ে দিলেন। নিজের নাম পালটালেন। পরিবেশ অনুকূল থাকায় তাঁর দরখাস্তও মঞ্জুর হল। তারপর পনেরো মাস কেটে গেছে। একনাগাড়ে হেলথফুল হাউসে অন্তরীন টমাস রোসের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তিনি।

এতটুকু স্বার্থপরতা ছিল না তাঁর এই সিদ্ধান্তে বরং ছিল মহান দেশপ্রেম আর দুর্লভ নিঃস্বার্থপরতা। কেন না, যে কাজে তিনি বহাল হয়েছেন, সে কাজ সাইমন হার্টের মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মানুষের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে টমাস রোসের জ্ঞানভাণ্ডার লুঠ করার কুমতলব নিয়ে সাইমন হার্ট এখানে আসেননি। হার্টের উদ্দেশ্যই ছিল টমাস রোসের গোপন রহস্য জানা এবং পরে, রোস তাঁর যুক্তিবুদ্ধি ফিরে পেলে, সমস্ত লাভটুকু তাঁকেই ফিরিয়ে দেওয়া।

সুতরাং পনেরো মাস ধরে সাইমন হার্ট ওরফে গেডন পাগল

টমাস রোসের সান্নিধ্যে রয়েছেন, তাঁকে পাহারা দিয়েছেন, চোখে চোখে রেখেছেন, এমন কি জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন—কিন্তু কোনো তথ্যই বার করতে পারেন নি। আবিষ্কারকের বকবকানি যতই শুনেছেন, ততই আবিষ্কারটার অসামান্য গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিষ্কার হয়েছে। এবং প্রতি মুহূর্তে একটি শংকাই উদ্বেগাকুল রেখেছে অন্তরকে। টমাস রোসের আংশিক মস্তিষ্ক বিকৃতি যদি সম্পূর্ণ হয়, যদি ধীশক্তির শেষ দীপশিখাটিও নিভে যায়, তাহলেই বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হবেন বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ টমাস রোস। অথবা মারাত্মক কোন দুর্ঘটনায় প্রাণবিয়োগ ঘটলেও গুপ্তরহস্য গুপ্তই থেকে যাবে চিরতরে। এ হেন পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছিলেন সাইমন হার্ট। জাতির স্বার্থে এ হেন মহান কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তিনি।

যাইহোক, সবল কাঠামোর দৌলতে রোগীর শারীরিক স্বাস্থ্যের কোনরকম অবনতি ঘটেনি। মন মেজাজের স্নায়বিক প্রাণশক্তিই ঠেকিয়ে রেখেছে যাবতীয় আক্রমণ, শরীর ভাঙতে দেয়নি। মানুষটির উচ্চতা মাঝামাঝি, মস্ত মাথা, সুউন্নত ললাট, সুগঠিত করোটি, ধূসর কেশ, দৃষ্টি মাঝেমাঝে উদ্‌ভ্রান্ত হলেও উজ্জ্বল, স্থির, শক্তিমান চিন্তার ঝলসানিতে প্রভুত্বপরায়ণ, কম্পিত নাসারন্ধ্রের নীচে পুরু গোঁফ, দৃঢ়সম্বদ্ধ অধরোষ্ঠ যেন সদাই কোনো রহস্য সেখানে আবৃত, চিন্তাশীল মুখাবয়ব—বহু পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যেও নিঃশঙ্ক থাকবার মত ব্যক্তিত্ব মুখের পরতে পরতে—এই সব মিলিয়ে হলেন আবিষ্কারক টমাস রোস, যিনি সম্ভবত নিজেও জানতেন না যে ইঞ্জিনীয়ার সাইমন হার্ট ওরফে রক্ষক গেডনের তত্ত্বাবধানে অন্তরীন হয়ে রয়েছেন তিনি হেলথফুল হাউসেরই একটি ভবনে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাউন্ট দ্য আর্টিগাস

কে এই কাউন্ট দ্য আর্টিগাস? স্প্যানিয়ার্ড? নাম শুনলে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু তাঁর স্কুনারের গলুইয়ে সোনালী অক্ষরে লেখা আছে 'এব্বা'—যা কিনা নরওয়ের নাম। কাউন্টকে তাঁর ক্যাপ্টেনের নাম জিজ্ঞেস করলে বলবেন 'স্পেড', সারেঙের নাম 'এফনডাট', আর পাচকের নাম 'সেলিন'। প্রতিটি নামই আশ্চর্যরকমের সামঞ্জস্যবিহীন এবং বেশ বোঝা যায় তারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্নজাতের মানুষ!

কাউন্টের চেহারা দেখেও কিছু অনুমান করা কঠিন। গায়ের রঙ, কুচকুচে কালো আর চলাফেরার খানদানিভাব দেখে মনে হতে পারে স্পেন তাঁর আদি নিবাস, কিন্তু আইবেরিয়ানদের জাতিগত কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই তাঁর শরীরের অন্যান্য অংশে।

উচ্চতায় তিনি মাঝামাঝি নন, তার চাইতেও বেশী। অত্যন্ত মজবুত গড়ন। বয়স খুব জোর চল্লিশ। মেজাজ যেমনি প্রশান্ত আবার তেমনি উদ্ধত। অবিকল হিন্দু প্রিন্সের মত—সেইসঙ্গে মিশেছে উৎকৃষ্ট মালয় রক্ত। দাম্ভিক ভাবভঙ্গী আর অতর্কিত বক্রিমে দেখে অন্তত তাই মনে হয়। যে ভাষায় তিনি মাঝিমাল্লার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, তা কিন্তু ভারত মহাসাগর আর আশপাশের সাগরের দ্বীপসমূহে প্রচলিত বহু সংলাপের অন্যতম। তা সত্বেও প্রাচীন অথবা নতুন কোনো দুনিয়ার তীরভূমিতে নেমে তিনি আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্যে ইংরেজি বলতেন। ইংরেজিটা যে তাঁর মাতৃভাষা নয়, তা বোঝা যেত উচ্চারণের সামান্য তারতম্য শুনে।

কাউন্ট দ্য আর্টিগাসের অতীত কি? কোন ঘটনাবলীতে আবৃত তাঁর এই রীতিমত রহস্যজনক অস্তিত্ব? তাঁর সামাজিক মর্যাদাই বা কি আর কোত্থেকেই বা আসছে এই বিপুল বৈভব? সংক্ষেপে তাঁকে কুবের বললেও অত্যুক্তি হয় না কেননা সূক্ষ্মরুচি আর খুঁতখুঁতে স্বভাব নিয়ে ভদ্রলোকের মত জীবনযাপন করতে গিয়ে খোলামকুচির মত

টাকা ওড়াতে মোটেই কার্পণ্য করতেন না কাউন্ট। কোথায় তাঁর নিবাস? নিদেনপক্ষে স্কুনারের আদিবন্দরটাই বা কোন দেশে? কেউ জানে না। অল্পভাষী কাউন্টকে এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করারও সাহস হত না কারো। আমেরিকান রিপোর্টার তো দূরের কথা, যে কোনো দেশের সাংবাদিকের ইন্টারভিউতে বসে কথার বল্‌গা অল্‌গা করার পাত্র যে তিনি নন, তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত।

খবরের কাগজে কাউন্ট সম্পর্কে যে সব খবর বেরুত, তার বেশী আর কিছুই জানার উপায় ছিল না। বন্দরে স্কুনার 'এব্বা' ভিড়লেই খবরটা বেরুত বিভিন্ন কাগজে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের একটা না একটা বন্দরেই সাধারণত আসত এব্বা। আসত নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে। দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রার উপযোগী প্রচুর রসদ তুলতো স্কুনারে। চড়া দাম দিত প্রতিটি জিনিসের জন্যে। ডলার, গিনি, এমন কি অন্যান্য মুদ্রারও অভাব ঘটত না কাউন্টের।

তাই কাউন্টের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা না থাকলেও ফ্লোরিডা থেকে নিউ ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত বিভিন্ন বন্দরে একডাকেই তাঁকে চিনত সবাই।

সেই কারণেই তিনি আসছেন শুনে হেলথফুল হাউসের ডিরেক্টর যে নিজেকে সম্মানিত মনে করবেন, এতে আর আশ্চর্য কি!

নিউবার্ণ পোতাশ্রয়ে এই প্রথম এল স্কুনার 'এব্বা'। মালিকের নিছক খেয়ালের জন্যেই নিউজের এর মোহানায় পৌঁছোলো স্কুনার। কিন্তু কেন এই অঞ্চলে এলেন কাউন্ট দ্য আর্টিগাস? আবার রসদ বোঝাই করতে? না। কেননা, অন্যান্য বড় বন্দরে যে পরিমাণ রসদ তিনি পাবেন, তা তো পামলিকো সাউণ্ডে পাওয়া যাবে না। নিউজ-এর মোহানায়, নিউবার্ণের গুরুত্বহীন শহর বাজারে পিয়াস্ত্রে আর ব্যাংক-নোটের বিনিময় এমন কি রসদ আশা করতে পারেন কাউন্ট দ্য আর্টিগাস? যদিও কয়েক হপ্তা আগেই চার্লসটনে দিন দশেক থাকা-কালীন বিস্তর মালপত্রে স্কুনার বোঝাই করেছেন কাউন্ট? গন্তব্যস্থান?

অন্যান্য বারের মতই তা অজ্ঞাত।

তাহলে কি শুধু হেলথফুল হাউস দেখবার জন্যেই এসেছেন দুর্বোধ্য প্রহেলিকাবৎ এই মানুষটি ? এমন হতে পারে যে অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই তাঁর এই হঠাৎ আগমনের পেছনে। কেননা, হাজার হোক, তাঁর আসাটাও তো একটা বিরাট ব্যাপার, উৎসব বললেই চলে। সত্যিকারের এবং যুক্তিযুক্ত উৎসব।

হয়ত টমাস রোসের সঙ্গে আলাপ করার একটা মনোগত বাসনাও ছিল কাউন্টের। ফরাসী আবিষ্কারকের নাম যখন দিকে দিকে, তখন তাঁর মত দিকপাল সম্পর্কে ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। পাগল প্রতিভা টমাস রোস, যাঁর আবিষ্কার আধুনিক সমরকলায় বিপ্লব আনতে চলেছে, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার।

পূর্বব্যবস্থা মত বিকেলের দিকে হেলথফুল হাউসে পৌঁছোলেন কাউন্ট দ্য আর্টিগাস। সঙ্গে এলেন এব্বার কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন স্পেড। তৎক্ষণাৎ দুজনকেই সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ডিরেকটরের সমীপে। ডিরেক্টর ভদ্রলোক তো আদর আপ্যায়নের ঠেলায় অতিথিদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুললেন এবং নিজেই তাঁদের ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব নিলেন। মাননীয় অতিথিদের 'গাইড' হওয়ার সম্মান তিনি অধস্তন কর্মচারীদের নিতে দিলেন না। কাউন্টও খুশী হলেন তাঁর বিগলিত ব্যবহার দেখে। কমনরুম আর প্রাইভেট রুম দিয়ে শুরু করলেন ডিরেক্টর। রোগীদের সুখসুবিধের বিস্তারিত ফিরিস্তি দিলেন তিনি। সে ফিরিস্তি যদি অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিতে হয় তাহলে বিশ্বাস করতে হবে যে হেলথফুল হাউসে যারা আসে, তারা বাড়ীর চাইতে ঢের বেশী যত্নের মধ্যে থাকে। আর এই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলেই আরোগ্য ভবনে আরোগ্যের হার নেহাৎ কম নয়।

অভ্যেস মত বোকা-বোকা মুখ করে সব শুনলেন কাউন্ট। ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল ডিরেক্টরের অফুরন্ত বচনবিন্যাসে তিনি মুগ্ধ। আগমনের

প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করার জন্যেই ভান করছিলেন, এমন হওয়াটাও বিচিত্র নয়। ঘণ্টাখানেক পরে জিজ্ঞেস করলেন—"ভাল কথা, শুনেছি হেলথফুল হাউসে সম্প্রতি এমন এক রোগীকে আনা হয়েছে যিনি নাকি বিশ্ব-বিখ্যাত বললেই চলে?"

"মঁসিয়ে লা কোঁতো বোধকরি টমাস রোসের কথাই বলছেন?" বললেন ডিরেক্টর।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভদ্রলোক জাতিতে ফরাসী। আবিষ্কারক। কিন্তু মাথাটাই নাকি খারাপ হয়ে গেছে।"

"খুবই খারাপ হয়েছে। হয়ে হয়ত ভালই হয়েছে কেন না, আমার মতে, যে সব আবিষ্কারে ধ্বংস করার নিত্য নতুন পন্থা মানুষের হাতে আসে, সে সব আবিষ্কারে মানব সমাজের সতিকারের কোনো উপকারই হয় না। ইতিমধ্যেই এ পথে বিজ্ঞান যা এগিয়েছে, তাই কি যথেষ্ট নয়!"

"কথাটা খাঁটি," সায় দিলেন কাউণ্ট। "আপনার সঙ্গে আমিও একমত। সত্যিকারের প্রগতি এ পথে আসে না। আমার মতে এই ধরনের আবিষ্কারগুলোই মানুষে মানুষে হিংসা দ্বেষ বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। ভদ্রলোকের মগজ কি একেবারেই বিগড়েছে?"

"একেবারে বললে ভুল বলা হবে, মঁসিয়ে লা কোঁতো। রোজকার কাজ সম্বন্ধেই তিনি কেবল বেহুঁশ। তখন আর তার কোন দায়িত্ব-বোধও থাকে না, বোধশক্তিও থাকে না। কিন্তু আবিষ্কার প্রতিভায় একটুও টোল খায় নি। মানসিক বিপর্যয় সত্ত্বেও বিজ্ঞান-চেতনা এখনও টনটনে। ভদ্রলোকের দাবীদাওয়া যদি মেনে নেওয়া হত, তাহলে যে তিনি এর মধ্যেই আরো কয়েকটা নতুন হাতিয়ার তৈরী করে বসতেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কারো দরকারে লাগুক না লাগুক, আবিষ্কার তিনি করতেনই।"

"ঠিক কথা, ঠিক কথা, কোন সন্দেহই নেই তাতে," বললেন কাউণ্ট এবং ক্যাপ্টেন স্পেকর মুখবয়ব দেখে মনে হল তিনিও একমত।

"এই যে এসে গেছি। এই হল টমাস রোসের··প্যাভিলিয়ন। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্যে ওঁকে এখানে আটক রাখা হলেও সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি রাখিনি। এ অবস্থায় যা যা দরকার, সবই করছি। তা ছাড়া এখানে থাকা মানেই টমাস রোসকে· যারা· কাজে ·লাগাতে চায়। তাদের নাগালের বাইরে থাকা—"

বলে, অর্থপূর্ণভাবে মাথা হেলালেন ডিরেক্টর। দেখেশুনে এক দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল মঁসিয়ে লা কোঁতোর অধর প্রান্তে।

"মঁসিয়ে রোস কি একলাই থাকেন?" জিজ্ঞেস করলেন কাউন্ট।

"না মঁসিয়ে কোঁতো, একজন পরিচারক ওঁকে চব্বিশঘণ্টা নজরে রাখে। আবিষ্কারটা সম্বন্ধে কোন মুহূর্তে কোনো কথা ফাঁস করে করে ফেললেই সে তা সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেবে। তারপর দেখা যাবে তা দিয়ে কোনকাজ হয় কি না।"

ক্যাপ্টেন স্পেডের দিকে বিদ্যুৎচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন কাউন্ট। প্রত্যুত্তরে এমন ভঙ্গী করলেন ক্যাপ্টেন যার সরল অর্থ— "বুঝেছি।"

এই সময়ে ক্যাপ্টেনকে চোখে চোখে রাখলে দেখা যেত সতের নম্বর প্যাভিলিয়ন সংলগ্ন বাগানটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখছেন তিনি। পথঘাট গুলোর ওপর তীক্ষ্ণ চাহনি বুলিয়ে নিচ্ছেন। পথ চলছেন হিসেব করে যেন পথচলার পরিকল্পনা আগে থেকেই গজ গজ করছে করছে মাথায়। বাগানের চারিদিকে উঁচু পাঁচিল। একদিকে পাহাড়ের সানুদেশ। অপর দিকে নদীতীর। ঢালু হয়ে সেইদিকেই নেমে গেছে বাগান।

বাড়ীটা একতালা। ছাদওলা বাড়ী। বাড়ীর মধ্যে দুটো ছোট ঘর, একটা বড় হলঘর। প্রতিটি জানালায় লোহার গরাদ বসানো। বাড়ীর চারদিকে গাছের বাহার। গ্রীষ্মের পত্রপুষ্পে শোভিত তাদের শাখাপ্রশাখা। বাড়ীর সামনে সবুজ লন। মখমলের মত কোমল। এখানে সেখানে ঝোপ। রঙীন ফুলের যেন হাট বসেছে সে সব ঝোপে।

সমস্ত অঞ্চলটার ক্ষেত্রফল প্রায় দেড়বিঘে। টমাস রোসের জন্যে তা সংরক্ষিত। যখন খুশী তিনি বাগানে আসবেন, বেড়াবেন—কিন্তু কখনোই রক্ষকের চোখের আড়ালে যেতে পারবেন না।

কাউণ্ট দ্য আর্টিগাস, ক্যাপ্টেন স্পেড আর ডিরেক্টর ঘেরাও অঞ্চলে পৌঁছে দেখলেন প্যাভিলিয়নের দরজায় দাঁড়িয়ে টমাস রোসের রক্ষক গেডন।

স্থিরচোখে গেডনের দিকে তাকিয়ে রইলেন কাউণ্ট। যেন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই দেখতে লাগলেন তার আপাদমস্তক।

হেলথফুল হাউসে বাইরের লোক হামেশাই আসে। তাছাড়া, সতেরো নম্বর প্যাভিলিয়নের বিখ্যাত পুরুষটিকে দেখবার জন্যে দর্শনার্থীর ভীড় তো লেগেই থাকে। কেননা, এই আরোগ্যনিকেতনে দর্শনীয় মানুষ বলতে শুধু টমাস রোসকেই বোঝাত। তা সত্ত্বেও সেদিনের দুই দর্শনার্থীকে দেখে আকৃষ্ট না হয়ে পারল না গেডন। কাউণ্ট আর ক্যাপ্টেনের জাতি নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। কাউণ্ট দ্য আর্টিগাসের নামটা অবশ্য অপরিচিত নয়, কিন্তু পূর্ব অঞ্চলের বন্দরসমূহে বেশ কয়েকবার গিয়েও স্বনামধন্য ব্যক্তিকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য তার কখনো হয়নি। সেই মুহূর্তে যে কাউণ্টের স্কুনার 'এব্বা' হেলথফুল হাউসের কাছেই নোঙর ফেলেছে, তাও জানা ছিল না গেডনের।

ডিরেক্টর শুধোলেন—"গেডন, টমাস রোস কোথায়?"

"ওই তো হোথায়" আঙুল তুলে দেখাল গেডন। বাগানের গাছের ছায়ায় ছায়ায় দেখা গেল ধ্যানস্তিমতি চোখে পায়চারী করছেন একজন পুরুষ।

"কাউণ্ট দ্য আর্টিগাস হেলথফুল হাউস দেখতে এসেছেন। যাঁকে নিয়ে ইদানীং এত কথা, সেই টমাস রোসকে না দেখে তো উনি যাবেন না।"

"ফেডারল গভর্ণমেণ্ট তাঁকে সময়মত এখানে আটক না রাখলে

কথার পরিমাণ বাড়তো বই কমত না।”

“সাবধান হওয়াটা একান্তই দরকার হয়ে পড়েছিল, মঁসিয়ে লা কোঁতো।”

“তাতো বটেই, তাতো বটেই, মঁসিয়ে ডিরেক্টর। দুনিয়ার শান্তির জন্যেই টমাস রোসের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আবিষ্কার রহস্যেরও সমাধি হওয়া নিতান্তই দরকার।”

চকিতে কাউন্টের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল গেডন। কিন্তু কোনো জবাব দিল না। দুই দর্শনার্থীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল—ঘেরাও জায়গাটার একপ্রান্তে।

কয়েক পা এগোতেই সামনে পড়লেন টমাস রোস।

যাঁকে দেখতে আসা, সেই মানুষটি কিন্তু তখনও বুঝতে পারেন নি যে এতগুলি লোক এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে, এমন কি এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক সামনে। এ যেন চলমান নির্বিকল্প সমাধি।

কারুর মনে সন্দেহ না জানিয়েই তীক্ষ্ণ চঞ্চল চোখে এবার জমি-পরীক্ষা করছিলেন ক্যাপ্টেন স্পেড। মনে মনে এঁকে নিচ্ছিলেন সতেরো নম্বর প্যাভিলিয়নের প্রকৃত অবস্থানটা। বাড়ীটা হেলথফুল হাউসের নীচের দিকে অবস্থিত। জমি এখানে ক্রমাগত ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাঁচিলের দিকে। চোখ তুলতেই পাঁচিলের ওপর দিয়ে দেখা গেল মাস্তুলের ডগা। নিশ্চিন্ত হলেন ক্যাপ্টেন স্পেড। এ মাস্তুল স্কুনার ‘এব্বা’র অর্থাৎ পাঁচিলের পরেই নদীতীর।

নিশ্চল দেহে নির্বাক মুখে ফরাসী আবিষ্কারককে দেখছিলেন কাউন্ট দ্য আর্টিগাস। শুধু দেখছিলেন বললে কম বলা হয়, নিরীক্ষণ করছিলেন। মানুষটি এখনও তেজোময়, দৃপ্ত। আঠারো মাসের বন্দীদশাতেও শরীরে এতটুকু ভাঙন ধরেনি। স্বাস্থ্য অটুট থাকলেও অদ্ভুত আচরণ, অসংলগ্ন অঙ্গভঙ্গী, উদভ্রান্ত দৃষ্টি, এবং আশপাশের সবকিছুর প্রতি চরম ঔদাসীন্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, মন তাঁর অটুট নেই, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সমতা আর সামঞ্জস্য

বোধ তিরোহিত হয়েছে মগজের প্রতিটি কোষ থেকে।

টমাস রোস তখন সবে একটা বেঞ্চিতে বসেছেন। হাতের বেত দিয়ে রাস্তার জড়োকরলেন ছোট ছোট কয়েকটা বালির স্তূপ—নিঃসন্দেহে কেল্লার বুরুজ। যেন অগণিত ক্ষুদে পতাকা। এমন তন্ময় হয়ে রইলেন এই সব নিয়ে ক্ষণেকের জন্যেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না দর্শকদের। আগাগোড়া চোখে মুখে রীতিমত সিরিয়াস ভাব নিয়ে ব্যাপৃত রইলেন দুর্গ রচনায়।

ছেলেখেলা সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো ছেলেই এতখানি গম্ভীর হতে পারে না এ খেলাখেলার সময়ে।

"একেবারেই পাগল হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে?" শুধোলেন কাউণ্ট। নির্বিকার থাকার চেষ্টা করেও আর থাকতে পারলেন না, নিরাশা বেজে উঠল কণ্ঠস্বরে।

"মঁসিয়ে লা কোঁতো, কোনো কথাই আর ওঁর পেট থেকে বার করা যাবে না," জবাব দিলেন ডিরেক্টর।

"আমাদের ভ্রূক্ষেপের মধ্যেও আনবেন না নাকি?"

"সেটা ওঁর পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য," বলে রক্ষকের দিকে ফিরে ডিরেক্টর বললেন—"গেডন, কথা বল ওঁর সঙ্গে। তোমার গলা শুনলে হয়ত সাড়া দেবেন।"

"তা দেবেন," বললে গেডন। তারপর আলগোছে টমাস রোসের কাঁধ স্পর্শ করে নীচু গলায় নাম ধরে ডাকল তাঁকে।

মাথা তুললেন টমাস রোস। এতজনের মধ্যে রক্ষক ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেলেন না। নীরব বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কাউণ্ট দ্য আর্টিগাস, ক্যাপটেন স্পেড আর ডিরেক্টর।

ইংরেজীতে বলল গেডন—"টমাস রোস, আপনার সঙ্গে কয়েকজন ভদ্রলোক আলাপ করতে এসেছেন। তাঁরা জানতে চান আপনার শরীর কিরকম, আপনার কাজকর্ম—"

শেষ শব্দটিই টমাস রোসের চেতনায় গিয়ে বিঁধল।

"আমার কাজকর্ম ?" ইংরেজিতেই শুধোলেন তিনি। উচ্চারণ শুনেই বোঝা গেল এ ভাষাতেও তাঁর সমান দক্ষতা।

বলেই, একটা নুড়ি তুলে নিলেন। রাস্তার চ্যাংড়া ছেলেরা যে ভাবে গুলী খেলে, ঠিক সেই ভাবে বুড়ো আঙুল আর মধ্যমার মধ্যে ধরে একটা বালুকাস্তূপের দিকে টিপ করলেন। পরমুহূর্তেই নিক্ষিপ্ত নুড়িতে বিধ্বস্ত হয়ে গেল বালির ঢিবিটা।

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন টমাস রোস—"পতন হয়েছে! কেল্লার পতন হয়েছে! আমার বিস্ফোরকের এক ঘায়েই গুঁড়িয়ে গেছে কেল্লা!"

বলতে বলতে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। বিজয়োল্লাসের রোশনাই ঝিকিমিকি করতে লাগল তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দুই চোখে।

কাউন্ট দ্য আর্টিগাসকে বললেন ডিরেক্টর—"দেখলেন তো, আবিষ্কারের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নেই ওঁর মাথায়।"

"মরবেনও এই চিন্তা নিয়ে—কেউ জানতেও পারবে না" বেশ জোরের সঙ্গে বললেন গেডন।

"গেডন, ওঁকে কথা বলাতে পারো না? ওঁর সেই আবিষ্কার, মানে যাকে উনি ফালগারেটর বিস্ফোরক বলেন, সে সম্পর্কে ওঁকে দিয়ে দু চার কথা বলাতে পারো না?"

"আপনি আদেশ দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি, স্যার।"

"আমার তো মনে হয় কাউন্ট দ্য আর্টিগাস তাতে খুশীই হবেন।"

"নিঃসন্দেহে," সায় দিলেন কাউন্ট। চোখ মুখের রেখায় কিন্তু ছায়াও পড়ল না তাঁর গোপন মতলবের।

"কিন্তু একটা ঝুঁকি নিতে হবে। পাগলামিটা আবার হয় তো বেড়ে যেতে পারে।"

"সে রকম লক্ষণ দেখলেই কথা বলা বন্ধ করে দিও। তুমি বলো, একজন ভদ্রলোক এসেছেন ফালগারেটর কিনতে। তার আগে একটু দরদাম করা তো দরকার।"

"গুপ্ত রহস্যটা বলে ফেলবেন না তো?" বাধা দিলেন কাউন্ট।

প্রশ্নটা করলেন এমন আন্তরিকভাবে যে গেডনের চকিত চাহনির মধ্যে অবিশ্বাসটা আর গোপন করা গেল না। তাতে অবশ্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না মূর্তিমান প্রহেলিকার মত কাউন্ট দ্য আর্টিগাস।

গেডন জবাব দিল—"ভয়ের কিছু নেই। দাবীমত লাখ লাখ টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত হাজার প্রতিশ্রুতি দিলেও গুপ্ত সূত্র উনি ফাঁস করবেন না।"

"টাকা নিয়ে তো আমি আসি নি এখানে" শান্ত কণ্ঠে বললেন কাউন্ট।

রোগীর দিকে আবার ঘুরে দাঁড়াল গেডন। কাঁধ স্পর্শ করে করে বললে—"টমাস রোস, কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন আপনার আবিষ্কার কিনতে।"

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত সটান মাথা তুলে হেঁকে উঠলেন টমাস রোস—"আমার আবিষ্কার? আমার বিস্ফোরক? আমার স্ফোটক?"

উত্তরোত্তর বর্ধিত উত্তেজনা দেখেই বোঝা গেল গেডন যা ভয় করেছিল, তাই হতে চলেছে! উন্মত্ততার আর একটা প্রকোপ এসে গেল বলে। এ ধরনের প্রশ্ন শুনলেই ক্ষেপে ওঠেন টমাস রোস, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

"কত দেবেন আমাকে? কত?" চড়াগলায় জানতে চাইলেন টমাস রোস।

টাকার অংক যত বিপুলই হোক না কেন, বলতে কোন বাধা ছিল না।

"কত? কত?" তারস্বরে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন রোস।

"এক কোটি ডলার;" জবাব দিলে গেডন।

"এক কোটি! যে ফালগারেটর যে কোনো বোমার চাইতে এক কোটি গুণ বেশী শক্তিশালী, তার জন্যে মাত্র এক কোটি ডলার! স্বয়ংচালিত যে ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরণ দশ হাজার বর্গগজের মধ্যে সব

কিছু রেণু রেণু করে দেবে, তার জন্যে মাত্র এক কোটি ডলার! প্রলয়ং-পর এই বিস্ফোরণ যে স্ফোটকের জন্যে সম্ভব—তার দাম মাত্র এক কোটি ডলার! দুনিয়ার সব সম্পদ দিয়েও আমার যে গুপ্ত অস্ত্র কেনা যায় না—তাকে এই সামান্য দামে বিকোনোর আগে যেন আমার জিভটাই আমি দাঁতে কামড়ে কুচিয়ে ফেলি! এক কোটি! মাত্র এক কোটি! যার দাম হওয়া উচিত এক হাজার কোটি, লক্ষ কোটি, শত পরার্ধ—তার দাম কিনা মাত্র এক কোটি! ধিক্! ধিক্! ধিক্!"

বেশ বোঝা গেল, টমাস রোসের সঙ্গে সঙ্গে দরদাম করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। মাত্রাজ্ঞান যিনি হারিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে ব্যবসায়িক রফা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। গেডন যদি একহাজার কোটি ডলারও দিতে চাইত, টমাস রোস অমনি হেঁকে বসতেন তার চাইতেই বেশী।

সুরু থেকেই অনিমেষে ক্ষিপ্ত টমাস রোসের বাক্যস্রোত শুনছিলেন কাউণ্ট দ্য আর্টিগাস আর ক্যাপ্টেন স্পেড। আগের মতই কাউণ্ট নির্বিকার থাকলেও হতাশার হাল্কা মেঘ জমেছিল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। আর স্পেড তো এমনিভাবে মাথা নাড়ছিলেন যার সরল অর্থ দাঁড়ায় এই: "একেবারেই বদ্ধ উন্মাদ। এঁকে নিয়ে আর কিছুই করার নেই।"

সবশেষে পালিয়ে গেলেন টমাস রোস। বাগানের মধ্যে দিয়ে বেগে ছুটতে ছুটতে প্রচণ্ড রাগে অবরুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করতে লাগলেন—"হাজার হাজার কোটি! হাজার হাজার কোটি!"

গেডন ঘুরে দাঁড়াল ডিরেক্টরের দিকে। ছোট্ট করে বললে—"আগেই সাবধান করেছিলাম আপনাকে!"

বলেই দৌড়োলো রোসের পিছু পিছু। কাছে গিয়ে কোনো বাধা দিলে না। হাতে হাত দিয়ে নিয়ে গেল প্যাভিলিয়নে। তারপর দরজায় চাবী দিয়ে দিলে।

কাউণ্ট দ্য আর্টিগাস একাই দাঁড়িয়ে রইলেন ডিরেক্টরের সঙ্গে।

আর ক্যাপটেন স্পেড অবোর পাঁচিলের ধারে ধারে পায়চারী করতে করতে বাগান পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

ডিরেক্টর বললেন—"মঁসিয়ে লা কোঁতো, বাড়িয়ে বলছি না। রোসের ব্যায়রাম রোজই বাড়ছে। আমার তো মনে হয়, বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন সেরে ওঠার কোন প্রশ্নই থাকবে না। তখন ওঁর দাবীমত সব টাকা দিয়েও আর কিছুই পাওয়া যাবে না।"

"কথাটা সত্যি," সায় দিলেন কাউন্ট দ্য আর্টিগাস। "তাহলেও কি জানেন, অসম্ভব রকমের মোটা অংকের টাকা চাইলেও এমন একটা কল উনি আবিষ্কার করেছেন যার ক্ষমতা এক কথায় সীমাহীন।"

"সে আবিষ্কারের গুরুত্ব বিচার করার যোগ্যতা যাঁদের আছে, মঁসিয়ে লা কোঁতো, এ অভিমত তাঁদের প্রত্যেকেরই। কিন্তু উনি যা আবিষ্কার করেছেন, তা অচিরেই চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে এইরকম একটা ক্ষ্যাপা মুহূর্তে। দিন দিন বাড়ছে উন্মত্ততা, প্রতিবারেই আরও ভয়াল হয়ে উঠছে তাঁর ক্ষ্যাপামি। এই অবস্থা আর কিছুদিন চললে যে মোটিভকে, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁর এত আগ্রহ, তাও মুছে যাবে ধোঁয়াটে মন থেকে। কুয়াশা ঢাকা অন্তরে এখনও রয়েছে মাত্র এই চেতনাটুকু—টাকা চাই, তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের উচিত মূল্য চাই—কিন্তু দুদিন বাদে আর সে-বোধও থাকবে না।"

"তখন হয়ত পড়ে থাকবে একটি মাত্র চেতনা। ঘৃণা অপরিসীম ঘৃণা!" বিড়বিড় করে আপন মনেই বললেন কাউন্ট দ্য আর্টিগাস। ঠিক এই সময়ে বাগান পর্যবেক্ষণ করে প্রধান তোরণের সামনে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন ক্যাপটেন স্পেড।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একজোড়া মানুষ গায়েব

আধঘণ্টা পরে দেখা গেল হেলথফুল হাউস আর Neuse নদীর দক্ষিণ তীরের মাঝের রাস্তায় সারি সারি গাছের ছায়ার পাশাপাশি হাঁটছেন কাউণ্ট দ্য আর্টিগাস আর ক্যাপটেন স্পেড। ডিরেক্টরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে গদগদকণ্ঠে সে ভদ্রলোক কাউণ্টকে জানিয়েছেন, তাঁদের আগমনে তিনি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছেন। কাউণ্টও তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আসবার সময়ে হেলথফুল হাউসের কর্মচারীদের জন্যে একশ ডলার দান করে কাউণ্টজনোচিত উদারতা এবং নীল রক্তের প্রমাণ দিয়ে এসেছেন।

লোহার গেট দিয়ে ভবন থেকে বেরিয়ে পাহাড় বেয়ে খানিকটা উঠেছেন দুজনে। তারপর পাঁচিল বরাবর হেঁটেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন অত উঁচু পাঁচিল টপকানো রীতিমত অসাধ্য ব্যাপার। কাউণ্ট আগাগোড়া চিন্তান্বিত। আর তিনি কথা বলবেন, এই প্রতীক্ষায় ক্যাপটেন নীরব।

সতেরো নম্বর প্যাভিলিয়নের কাছে এসে রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে পাঁচিলের উচ্চতাটা মনে মনে হিসেব করে নিয়ে বললেন কাউণ্ট— "বাড়ীটা খুঁটিয়ে দেখার সময় পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, মঁসিয়ে লা কোঁতো," পদবীটার ওপর বেশ জোর দিয়ে বললেন ক্যাপটেন স্পেড।

"কিছু চোখ এড়োয়নি তো?"

"দরকারী কিছুই এড়োয় নি। পাঁচিলের ওদিকে প্যাভিলিয়নে পৌঁছোতে বেশী সময় লাগবে না। আপনার প্রকল্পের ব্যাপারে যদি এখনও জেদ ধরে থাকেন—"

"স্পেড, জেদ আমার এখনও আছে।"

"ওঁর ঐ রকম মানসিক অবস্থা সত্ত্বেও?"

"হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও। ওঁকে এখান থেকে যদি তুলে নিয়ে যেতে

পারি—"

"সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। রাত হলেই আমি বাগানে ঢুকে ঠিক পৌঁছে যাব সতেরো নম্বর প্যাভিলিয়নে—কেউ দেখতেও পাবে না।"

"প্রধান ফটক দিয়ে?"

"না, এই দিক দিয়ে।"

"কিন্তু এখানে তো উঁচু পাঁচিল। যদিও বা পাঁচিল টপকে ঢোকো, রোসকে নিয়ে বেরোব কি করে? যদি পাগলটা চেঁচায়? ধ্বস্তাধ্বস্তি করে? হাঁকডাক শুরু করে দেয় রক্ষক—"

"ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমরা ভেতরে যাব, বাইরেও আসব ঐ দরজাটা দিয়ে।"

কয়েক পা দূরে ছোট্ট একটা দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন স্পেড। পাঁচিলের সঙ্গে প্রায় মিশে রয়েছে দরজাটা। নদীর তীরে কাজ পড়লে কর্মচারীরা এই দরজা দিয়ে যাতায়াত করে।

"বাগানে ঢুকব এই দরজা দিয়েই। মইয়ের দরকার নেই," বললেন ক্যাপটেন।

"কিন্তু দরজা তো দেখছি বন্ধ।"

"সময় এলেই খুলে যাবে।"

"ওদিকে ছিটকিনি লাগানো আছে না?"

"আমি খুলে রেখে এসেছি। ডিরেক্টরের চোখের আড়ালে গাছের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটবার সময়ে সে কাজ সেরে রেখেছি।"

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কাউন্ট দ্য আর্টিগাস। শুধোলেন—"খুলবে কি করে?"

"এই তো চাবী" বলে চাবীটা তুলে দেখালেন ক্যাপটেন। ছিটকিনি খুলে রাখার সময়েই চাবীটা পকেটস্থ করতে ভোলেন নি তিনি।

কাউন্ট বললেন—"তোফা কাজ করেছ, স্পেড। গায়েব করাটা খুব বেশী ঝঞ্ঝাটের কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। এখন স্কুনারে

যাওয়া যাক। রাত আটটায় চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে গেলে একটা নৌকোয় পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে তুমি আসবে এখানে—”

“হ্যাঁ, পাঁচজনই দরকার। রক্ষক ব্যাটা যদি গণ্ডগোল করে তাকে নিকেশ করার জন্যে পাঁচজনই দরকার।”

“নিকেশ যদি করতে চাও তো করতে পার। কিন্তু সব চাইতে ভাল হবে যদি গেডনকেও ‘এব্‌বা’তে এনে তুলতে পার। কে জানে, গোপন রহস্যর খানিকটা সে এর মধ্যেই জেনে বসে আছে কি না।”

“তা অবশ্য সত্যি।”

“তা ছাড়া রোস ওরই কথা শোনেনা। সুতরাং উনি যাতে অভ্যস্ত, সে রকম কোনো ব্যবস্থার অদলবদল করা ঠিক হবে না।”

কথার সঙ্গে এমন একটা রহস্যময় হাসি হাসলেন কাউন্ট যে বুঝতে বাকী রইল না হেলথফুল হাউসের ওয়ার্ডারের ওপর কি জাতীয় ডিউটি ন্যস্ত হবে।

কাজেই সব ঠিক হয়ে গেল জোড়া গায়েবের পরিকল্পনার। প্ল্যান যে শেষ পর্যন্ত সফল হবে, তাতেও কোনো সন্দেহ ছিল না। দিন ফুরোতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক অবশ্য দেরী। এই সময়ে কেউ যদি দেখে ফেলে যে পাঁচিলের ছোট দরজার চাবীর ফোকর থেকে চাবী উধাও হয়েছে, ছিটকিনিও খোলা, অবশ্য তাহলে সবই ভণ্ডুল হতে বাধ্য। আর তা যদি না হয়, তাহলে ক্যাপটেন স্পেড আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের ঠেকায় কে!

হেলথফুল হাউসে কেবলমাত্র টমাস রোসকেই বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। তিনি ছাড়া সেখানকার অন্যান্য রোগীদের ওপর কোন রকমের বাধানিষেধ ছিল না। হেলথফুল হাউসের ওপরের অংশে মূল ভবনের প্যাভিলিয়নে অথবা ঘরে তাঁরা থাকতেন। এই সব কারণেই ষড়যন্ত্রকারীরা নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁদের চক্রান্ত সম্বন্ধে। কেন না, অতর্কিতে যদি সতেরো নম্বর প্যাভিলিয়নে গেডন আর টমাস রোসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া হয়, আর খুব বেশী বাধা যদি

তাঁদের কাছ থেকে না পাওয়া যায়, এমনকি চেঁচামেচিও না করতে পারেন, তাহলেই তো কেল্লা ফতে। কিডন্যাপ্‌ড্‌ তাঁদের হতেই হবে।

নিশ্চিন্ত হওয়ার পর কাউণ্ট সঙ্গীকে নিয়ে এগোলেন খাড়ির দিকে। 'এব্‌বা'র একটা বোট ভাসছিল সেখানে। প্রায় ৮০০ হাত দূরে নোঙর করা ছিল সুদৃশ্য স্কুনারটা। পালগুলো হলদে রঙের বস্ত্রবন্ধনী দিয়ে মোড়া। মাস্তুলের ওপর পাল ছড়িয়ে দেওয়ার আড়া-আড়ি লম্বা কাঠটা খাড়াইভাবে দাঁড় করানো—প্রমোদ স্কুনারের রীতিই তাই। পেছনদিকের ওপরের অংশে কোনো পতাকাও উড়ছে না। শুধু মাস্তুলের ডগায় ঝুলছে একটা লম্বা লাল রঙের ধ্বজা। পূবহাওয়া পড়ে যাওয়ায় তা ঝুলেই রয়েছে—মাঝেসাঝে সামান্য নড়ে নড়ে উঠছে।

বোটে উঠে বসলেন কাউণ্ট আর ক্যাপ্টেন। দুজোড়া দাঁড়ের ঘায়ে দেখতে দেখতে বোট পৌঁছে গেল স্কুনারে। পাশে ঝোলানো মই বেয়ে দুজনে উঠে গেলেন ডেকের ওপর।

কেবিনের দিকে দ্রুতপদে চলে গেলেন কাউণ্ট দ্য আর্টিগাস। কিন্তু ক্যাপ্টেন এগিয়ে গেলেন চরম নির্দেশ দিতে। সামনের গলুইয়ের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাকালেন জলের দিকে। দেখা গেল, কয়েক ফ্যাদম দূরে ভাসছে ছোট্ট একটা বস্তু। একটা ক্ষুদে বয়া। জোয়ারের জলের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

রাত এল। নদীর বাঁ তীরে বাঁকের ওদিকে নিউবার্নের অস্পষ্ট রেখা মিলিয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। দিগন্তের পটভূমিকায় কালো কালো স্তূপের মত জেগে রইল বাড়ীগুলো—পশ্চিমের মেঘপ্রান্তের ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে তা একেবারে অদৃশ্য হল না। অপর প্রান্তে গাঢ় বাষ্পে অন্ধকার হয়ে এল আকাশ। কিন্তু বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা আছে বলে মনে হল না।

আটটার সময়ে ডেকে বেরিয়ে এলেন কাউণ্ট। সঙ্গে এলেন

এক জন প্রৌঢ়—বছর পঞ্চাশ বয়স।

কাউন্ট বললেন—"সার্কো, সময় হয়েছে।"

"স্পেডকে বলে আসি," জবাব দিলে সার্কো।

"তৈরী হও," বললেন কাউ   ।

"আমরা তৈরী।"

"হুঁশিয়ার থেকো, হেলথফুল হাউসের কারো ঘুম যেন না ভাঙে। কেউ যেন সন্দেহও করতে না পারে যে টমাস রোস আর তার ওয়ার্ডারকে 'এব্‌বা'য় তোলা হয়েছে।"

"তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও তো ওঁদের পাওয়া যাবে না," মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলল সার্কো।

"তাহলেও কারো সন্দেহকে না খুঁচোনোই ভাল।"

নামিয়ে দেওয়া হল বোটটা। উঠে বসলেন ক্যাপ্টেন স্পেড আর পাঁচজন জোয়ান। চারজন দাঁড়ে বসল। পঞ্চমজন অর্থাৎ সারেঙ এফনডাট, বসল হালে, ক্যাপ্টেনের পাশেই।

হাসিমুখে সার্কো বললে—"গুড লাক, স্পেড। মহিলা অপহরণের সময়ে যতটা হুঁশিয়ার দরকার, এক্ষেত্রেও যেন তাই থাকে।"

"তা থাকবে যদি না গেডন—"

"রোস আর গেডন—তুজনকেই দরকার আমাদের," মনে করিয়ে দিলেন কাউণ্ট ড্য আর্টিগাস।

"বুঝেছি," বললেন ক্যাপ্‌টেন।

দূরে সরে গেল বোট। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল কালির মত কালো অন্ধকারের মধ্যে।

বোট কখন ফিরে আসে, সেই প্রতীক্ষায় অন্ধকারের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল 'এব্‌বা'। যাত্রার কোনো আয়োজন করল না, সেরকম কোনো লক্ষণও দেখা গেল না। ভাবগতিক দেখে মনে হল, জোড়া গায়েবের পর নোঙর তুলে সটকান দেওয়ার কোনো মতলবই নেই। তাছাড়া, খোলা সমুদ্রে এখন পৌঁছোবেই বা কি করে? বাতাসের

চিহ্নমাত্র তো নেই। আর, আধঘন্টার মধ্যে জোয়ারের জলে নদীও ফুলে উঠবে।

তীরভূমি থেকে ৮০০ হাত দূরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে না থেকে আরও কাছে এগিয়ে যেতে পারত এব্বা। গিয়েও দশপনেরো ফুট গভীর জলে থাকতে পারত। তাতে কাজ শেষ করে ফিরে আসার সময়ে বোটেরও সুবিধা হত। কিন্তু তাসত্ত্বেও একই জায়গায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল স্কুনার এবং বুঝেশুনেই বিশেষ কারণেই এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন না কাউন্ট।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই সবার অলক্ষ্যে তীরভূমির কাছে এসে পৌঁছোলো বোট।

জনহীন নদীতীর। হেলথফুল হাউস পার্কের পাশের রাস্তাও নির্জন।

সারেঙকে নৌকোয় রেখে চারজন সঙ্গী নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ক্যাপ্টেন স্পেড। নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বৃক্ষসারির কালো চন্দ্রাতপের নীচে।

বাগানের পাঁচিলের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। দরজার সামনে তৈরী হয়ে দাঁড়াল চার জোয়ান। কয়েক ঘণ্টা আগে কাজ তিনি অনেকটা এগিয়ে রেখে গেছেন। সেই ব্যবস্থামত চাবীর ফোকরে চাবী ঢুকিয়ে ঘুরোলেই খুলে যাবে দরজা। কিন্তু ইতিমধ্যে কোনো কর্মচারী যদি চাবী উধাও আর ছিটকিনি খোলা দেখে আবার চাবী আর ছিটকিনি লাগিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেই সর্বনাশ সেক্ষেত্রে প্ল্যানমাফিক এত সহজে কিডন্যাপিং সম্ভব হবে না, পাঁচিল টপকেও নয়।

চাবীর ফোকরে কান লাগিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন স্পেড।

কোন শব্দ নেই বাগানের মধ্যে। সতেরো নম্বরের প্যাভিলিয়নের ধারে কাছে কি দরজার ওদিকেও আনাগোনার ক্ষীণতম পদশব্দ শোনা গেল না। নিস্তব্ধ এ পাশের রাস্তাও। বৃক্ষপত্রের মর্মরধ্বনিও নেই বাতাসের অভাবে। নিথর নিশায় সমস্ত অঞ্চলটা আশ্চর্যরকমের

নীরব, নিস্তব্ধ।

পকেট থেকে চাবী বার করলেন স্পেড। ফোকরে লাগিয়ে ঘোরাতেই ক্লিক শব্দে সরে গেল যান্ত্রিক বাধা। আলগোছে ঠেলতেই খুলে গেল দরজার পাল্লা। এতটুকু হেরফের হয়নি ক্যাপটেনের পূর্বব্যবস্থায়—আগের মতই রয়েছে সবকিছু।

অন্ধকারের মধ্যেই চোখ চালিয়ে যখন দেখা গেল প্যাভিলিয়নের আশেপাশে কেউ নেই, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বাগানে পদার্পণ করলেন স্পেড। স্যাঙাতরাও এল ভেতরে। কিন্তু দরজা শুধু ভেজানো রইল। পালানোর সময়ে যাত্রে এতটুকু সময় নষ্ট না হয়।

লম্বা লম্বা গাছের নীচে দেখা গেল সতেরো নম্বর প্যাভিলিয়ন—দেখা গেল শুধু একটি রাত্র আলোকরশ্মির আভায়। প্যাভিলিয়নেরই একটা জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছিল বাগানের ঘাসে।

ঘরটা নিঃসন্দেহে টমাস রোসের। আর গেডন যখন দিবানিশি তাঁর রক্ষক, তখন তাকেও পাওয়া যাবে ঐ একই ঘরে।

সতর্ক পদক্ষেপে সদলবলে এগোলেন ক্যাপটেন স্পেড। আলগা-নুড়ি অথবা ভাঙা ডালে পা লেগে যাতে শব্দ-টব্দ না হয়, সে বিষয়ে রীতিমত হুঁশিয়ার রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছো-লেন আলোময় জানলার পাশের দরজার সামনে। কিন্তু দরজা যদি বন্ধ থাকে? তাহলে তো পাগল টমাস রোসের ঘরেই পৌঁছোনো যাবে না? অনেকক্ষণ থেকেই সমস্যাটা নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া করছিলেন ক্যাপটেন স্পেড। এক হতে পারে, জানলার কাঁচ ভেঙে হাত গলিয়ে ছিটকিনি খুলে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়া। তারপর গেডন কিছু বোঝবার আগেই মুখ-টুক বেঁধে ফেলা। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

ঝুঁকি প্রচুর। ক্যাপটেন স্পেড যে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন, তা নয়। ঢুমদাম মারামারির চাইতে ধূর্তামিতেই তিনি বেশী পোক্ত। কিন্তু এ ছাড়া তোমার উপায়ও নেই। কাউন্টের আদেশমত টমাস

রোসকে তো পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যেতেই হবে, সম্ভব হলে গেডনকেও। সুতরাং যা কিছু করণীয়, তা করতেই হবে।

পা টিপে টিপে জানলার নীচে গিয়ে আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপটেন। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন ভেতরের দৃশ্য।

দেখলেন, উন্মাদ রোসের কাছেই বসে রয়েছে গেডন। দর্শনার্থীরা আসার পর থেকে উন্মত্ততার প্রচণ্ড ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারেন নি রোস। এ ধরনের প্রকোপের তীব্রতা হ্রাস করতে হলে বিশেষ শুশ্রূষার প্রয়োজন। সেই কাজেই নিয়োজিত রয়েছে গেডন। তদারক করছেন হেলথফুল হাউসের এক ডাক্তার। ডিরেক্টরই পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁকে।

আচ্ছা, মুস্কিল হলতো! ডাক্তারের উপস্থিতিতে গায়েব করতে যাওয়া মনেই খামোকা গোলমালের সৃষ্টি করা। চিন্তায় পড়লেন স্পেড!

সোফায় শুয়ে রয়েছেন রোস। পরণে পুরোদস্তুর পোশাক। অবস্থা অনেকটা শান্ত। আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছে আক্রমণের প্রচণ্ডতা। এরপরেও কয়েকঘণ্টা নিঝুম হয়ে থাকবেন রোস, তারপর সামলে উঠবেন।

ডাক্তার বিদায় নেওয়ার আয়োজন করতে লাগলেন। গেডনকে আশ্বাস দিলেন, রাত্রে আর কোনো ঝামেলা হবে না। কাজেই ভোরের আগে আর আসছেন না তিনি।

বলে, দরজার দিকে পা বাড়ালেন ডাক্তার! সেই মুহূর্তে যদি পাঁচজনে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে না পড়ত, তাহলে দরজা খোলার সঙ্গে শুধু ডাক্তার কেন, গেডনও দেখতে পেত আততায়ীদের।

চৌকাঠ মাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত করেছিলেন স্পেড। তড়িৎ গতিতে ঝোপের মধ্যে গাঢাকা দিয়েছিল চার সঙ্গী। ক্যাপটেন নিজে টুপ করে গুঁড়ি মেরে বসে পড়েছিলেন জানলার নীচে।

কপাল ভাল, লণ্ঠনটা টেবিলের ওপরেই রেখে এসেছিল গেডন।

না হলে ধরা পড়তে বেশী দেরী হত না।

চৌকাঠ পেরিয়ে প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বললেন—"এরকম প্রচণ্ড ঝোঁক কিন্তু কখনো দেখি নি। আরও বার দু তিন এ ঘটনা ঘটলেই টমাস রোসের মগজে যেটুকু চেতনা আছে, তাও যাবে।"

গেডন বললেন—"তাহলে ডিরেক্টরের উচিত আজ থেকে ওঁকে যাতে কেউ আর দেখতে না আসে, তার ব্যবস্থা করা। কে এক কাউন্ট দ্য আর্টিগাস এসেই তো আজকের ঘোঁট পাকিয়ে গেল। টমাস রোসের নাম শুনে তিনি ছুটে এসেছেন মানুষটিকে দেখতে। আর নিজেকে দেখাতে গিয়েই, দুটো কথা বলতে গিয়েই এই অবস্থার সৃষ্টি করেছেন মিঃ রোস।"

"বেশ, ডিরেক্টরকে আমি তা বলছি," জবাব দিলেন ডাক্তার।

বলে নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। দরজা খোলা রেখে পেছন পেছন গেডনও এল। ডাক্তারকে এগিয়ে দিতে গেল নুড়ি বিছোনো পথের শেষ পর্যন্ত।

বিশ পা যেতে না যেতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপটেন। পাশে এসে দাঁড়াল চার সঙ্গী।

এই তো সুযোগ। ঘর এখন ফাঁকা। এখনই টমাস রোসকে কাবু করে ফেলাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। তারপর গেডন ফিরে এলে তাকে নিয়ে পড়া যাবে 'খন ?

কিন্তু গেডন তো এক্ষুনি ফিরে আসতে পারে। এসেই যদি দেখে রোগী গায়েব, তাহলেই তো চেঁচামেচি জুড়ে দেবে, চীৎকার শুনে ডাক্তারও ফিরে আসবেন, হেলথফুল হাউসের সবাই জেগে উঠবেন। পাঁচিলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে বেরিয়ে গিয়ে তালা দেওয়ার সময়ও হয়ত পাবে না আততায়ীরা···

কিন্তু এত কথা ভাববারও সময় পেলেন না স্পেড···তার আগেই শোনা খড় মড় খড় মড় শব্দ···কাঁকড় মাড়িয়ে ফিরে আসছে গেডন সুতরাং, আগে তাকেই কাবু করা যাক। গলাবাজি যাতে না করতে

পারে, তার ব্যবস্থা করা যাক। চার পাঁচ জনের সঙ্গে টক্কর দেওয়া একা গেডনের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হবে না। সুস্থ লোকটাকে কায়দা করার পর অসুস্থ লোকটাকে বাগে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

ভাবতে ভাবতেই গাছের আড়ল থেকে বেরিয়ে এল গেডন—এগোতে লাগল সিঁড়ির দিকে। প্রথম ধাপে পা দিতে না দিতেই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল চারজন জোয়ান। চোখের পলক ফেলার আগেই সটান শুইয়ে দিলে রাস্তার ওপর, এবং আর্ত চীৎকার করার আগেই মুখের মধ্যে রুমাল ঠেসে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়ে গেল চোখ, হাত আর পা। এত শক্ত করে যে বেচারী ঠিক মড়ার মতই পড়ে রইল অসহায় ভাবে।

তু জন মাল্লা দাঁড়িয়ে রইল পাশে। বাকী তু জনকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপটেন স্পেড।

যা ভেবেছিলেন, সেই দৃশ্যই দেখলেন ক্যাপটেন। রোসের তখন এমনই মুহ্যমান অবস্থা যে ঝটাপটির শব্দেও তার হুঁশ ফেরেনি। সোফার ওপর শায়িত তার নিস্পন্দ দেহ। চোখের পাতা বন্ধ। গম্ভীর শ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে বুকের ওঠানামা না থাকলে তাঁকে মৃত বলেই ভ্রম হত। এরকম মানুষের হাত-পা-মুখ বাঁধার কোনো দরকার হয় না। কাজেই মাথা আর পায়ের কাছে গিয়ে ধরাধরি করে তুই স্যাঙাত টমাস রোসকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে এবং তৎক্ষণাৎ রওনা হল নৌকোর দিকে।

এত সব ঘটনা ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

সবার শেষে ঘর থেকে বেরুলেন ক্যাপটেন স্পেড। সন্তর্পণে আলো নিভিয়ে দিলেন, দরজা ভেজিয়ে দিলেন। পরের দিন ভোরের আগে যাতে কিছু জানাজানি না হয়ে সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে গেলেন।

গেডনকেও চ্যাংদোলা করে নিয়ে রওনা হল তুই সঙ্গী। বাগানের এদিকটা এমননিতেই নির্জন, তারপর বেজায় অন্ধকার। মূলভবন

অথবা অন্যান্য প্যাভিলিয়নের ক্ষীণতম আলোকরশ্মিও আসে না সে দিকে।

সুতরাং নির্বিঘ্নে পাঁচিলের ধার ঘেঁসে দরজার কাছে পৌঁছোলো নিশাচর আততায়ীরা। গেডনকে নিয়ে আগে বেরিয়ে গেল দুজনে। তারপরেই টমাস রোস। পেছন পেছন ক্যাপটেন স্পেড বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে চাবী দিয়ে দিলেন। চাবীটা সঙ্গেই রাখলেন। নৌকোয় উঠেই Neuse নদীগর্ভে ফেলে দেওয়ার জন্যে।

পথ জনমানবশূন্য। নদীতীর নির্জন।

বিশ পা এগোতেই দেখা হল এফনডাটের সঙ্গে ঢালু। নদীতীরে আড় হয়ে শুয়ে ছিল সে। রোস আর গেডনকে নৌকোয় তুলে দিয়ে দাঁড়ে বসে গেল চার জোয়ান।

সারেঙকে ডাক দিলেন ক্যাপটেন—"চটপট, আর দেরী না।"

এক সাথে চারটে দাঁড় পড়ল জলে। তীরবেগে স্কুনারের দিকে ধেয়ে গেল বোট। দূর থেকেই মাস্তুলের আলো দেখা যাচ্ছিল।

ঠিক দু মিনিট পরেই এব্বার পাশে গিয়ে ভিড়ল নৌকো।

মইয়ের কাছেই ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন দ্য আর্টিগাস।

বললেন—"কাম ফতে, স্পেড ?"

"কাম ফতে।"

"দু জনকেই ?"

"দুজনকেই—রক্ষক আর রক্ষিত !"

"হেলথফুল হাউসের কারো সন্দেহ হয় নি ?"

"কারো না !"

চোখ কান বাঁধা অবস্থায় কাউণ্ট দ্য আর্টিগাস আর ক্যাপটেন স্পেডের গলা শুনে চিনতে পারা অবশ্য সম্ভব ছিল না গেডনের পক্ষে।

তবে একটা জিনিস হয়ত লক্ষ্য করেছিল সে। রোসকে অথবা তাকে তৎক্ষণাৎ স্কুনারের ডেকের ওপর তোলা হল না! পাশের দিকে খানিকক্ষণ ঘসড়ানির শব্দ শোনা গেল। আধঘণ্টা পরে গেডন

বুঝতে পারল তাকে শূন্যে তুলে নামিয়ে দেওয়া খোলের গহ্বরে।

গায়েব হয়ে গেল জোড়া মানুষ। এরপর নোঙর তুলে মোহানা পেরিয়ে পামলিকো সাউণ্ডের দিকে রওনা হলেই খোলা সমুদ্রে পড়া যাবে। অথচ সেরকম কোনো তোড়জোড়ই দেখা গেল না স্কুনার 'এব্বা'র ডেকের ওপর।

কিন্তু সেটা বিপজ্জনক নয় কি? এক রাতেই দু' দুটো মানুষকে গায়েব করার পর ও জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ কি? নিশ্চয় নয়। তবে কি কাউণ্ট দ্য আর্টিগাস 'এব্বা'র মধ্যে বন্দীদের এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছে যে পরদিন সকালে হেলথফুল হাউসের অত কাছে থাকার দরুণ পুলিশ এসে তালাস করলেও তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাবে না?

নৌকো ফিরে আসার একঘণ্টা পরেই মাঝিমাল্লারা শুয়ে পড়ল যে যার ঝুলিখাটে; কাউণ্ট দ্য আর্টিগাস, মার্কো, ক্যাপটেন স্পেড গেলেন তাঁদের কেবিনে; গলুইয়ের কাছে পাহারায় রইল শুধু রাতের পাহারাদার। বাকী সবাই ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে। Neuse-এর শান্ত জলের ওপর নিশ্চল হয়ে ভাসতে লাগল স্কুনার এব্বা।

[পরের ঘটনা আগামী সংখ্যায়]

কম দামে সুন্দর সুন্দর বই !

অবসরের আনন্দে বই সংগ্রহ সহজ হলো

'ভাল বই পড়তে চাই, কিনতে চাই, নতুন নতুন লেখকের বিচিত্রতর রচনার স্বাদ পেতে চাই—কিন্তু পাই কোথায়—বইএর যা দাম ! কিনতে ভারী ইচ্ছে হয়, কিন্তু হতাশ হই দাম শুনে !'

হাজার হাজার পাঠকপাঠিকার এই দুঃখ আর বেশিদিন থাকবে না··· আশাতীত কম দামে বাছাই করা ভাল ভাল নতুন নতুন বই এখন থেকে বাড়ীতে বসেই পেতে থাকবেন "নাইস্ বুক ক্লাব"-এর মাননীয় সদস্যেরা···আনকোরা, সবেমাত্র প্যাকেট থেকে খোলা বই ! সদস্য হওয়ার জন্যে নামমাত্র ৮০ পয়সা রেজিসট্রেশন ফী দিয়ে শেষপৃষ্ঠার কুপনটি পূরণ করে পাঠালেই হলো। এত সহজ ! যে কোন সময়ে এক মাস আগে জানিয়ে সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়াও যায়, কোন বাধ্যবাধকতা নেই ! যতদিন সদস্য থাকবেন, "নাইস্ বুক ক্লাব" কর্তৃক সুনির্বাচিত বই পাবেন একেবারে সামান্য দামে। সেই সঙ্গে পাবেন সুরুচিসম্পন্ন অভিজাত পাঠকপাঠিকার উপযুক্ত তৃপ্তিকর সম্মান !

প্রতি মাসে একটি করে ভাল বই ! ছ'মাসের নির্বাচিত বইএর তালিকা পর পৃষ্ঠায় দেখুন········

এদেশে এমন সম্মানজনক সুযোগ এই প্রথম

ভাল বই পড়া আর পড়তে দেওয়ার আনন্দ

শুভ নববর্ষ ! মাসিক তালিকা

১৯৬৭

জানুয়ারীতে : গ্রেগরী মুখার্জীর পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস
"নতশির ঊর্মি"
(বাজারে ৫, সদস্যদের জন্য মাত্র ৩·৫০)
'পড়তে পড়তে মনে হয় চলচ্চিত্র'— আনন্দবাজার পত্রিকা

ফেবরুয়ারীতে : কোনান ডয়ালের বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ বই
"শার্লক হোম্‌স্‌ ফিরে এলেন" (অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত)
বাজারে ১০, ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৭,

মার্চ মাসে : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমস্ত ১৪টি উপন্যাস একত্রে
"বঙ্কিম রচনাবলী"
বাজারে ১২·৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ১০,

এপরিলে : ডাঃ রাধাগোবিন্দ দাসের নতুন উপন্যাস
"তিন অঙ্গে এক অঙ্গ"
বাজারে ৫·৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৩·৫০

মে মাসে : তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
"কান্না" (বাজারে ৬·৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৫·২৫)
'একটি নূতন জগতের উদ্‌ঘাটন করে বিস্মিত করেছেন'
—আনন্দবাজার পত্রিকা

জুন মাসে : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুন বই (সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ)
"পিতৃস্মৃতি" বাজারে ১৬, ; সদস্যদের জন্য মাত্র ১৩·৫০
ঠাকুর পরিবারের সচিত্র দুর্লভ স্মৃতিকথা সবেমাত্র বেরিয়েছে

এই ছ'মাসের মধ্যে যে-কোন দু'মাসের নির্বাচিত বই আপনি না নিয়ে তার বদলে পরপৃষ্ঠার তালিকা থেকে অন্য বই বেছে নিতেও পারেন। সবই পাবেন আশাতীত কম দামে—এদেশে এমন মজার নিয়মে বই কেনা এই প্রথম !

বদলী তালিকা

জগদীশপ্রসাদ দাসের নতুন উপন্যাস "হৃদয়ের স্বাক্ষর"

(বাজারে ৪৲ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৩৲)

আদিত্য ভট্টাচার্যের পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস "ঢেউভাঙ্গা মুক্তা"

(বাজারে ৬·৭৫ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৫৲)

কিঙ্কর অজিতকুমারের ধর্মগ্রন্থ "ওঙ্কার কথামৃত"

(বাজারে ৪৲ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ২·৫০)

সৈয়দ মুজতবা আলীর নতুন বই "বড়বাবু"

(বাজারে ৭·৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৬৲)

স্বরাজ বন্দোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস "গোপী সংবাদ"

(বাজারে ৩·৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ২·৭৫)

প্রবোধ সান্যালের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস "মনে রেখ"

(বাজারে ৬·৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৫·৫০)

মনে রাখবেন, যে-মাসের জন্য যে-বই ক্লাব কর্তৃক উপরিলিখিত মাসিক তালিকা মত নির্বাচিত হয়েছে, সেই মাসে সেই বইখানিই পাঠানো হয়। মাসিক তালিকার আগু-পিছু করলে অসুবিধা হয়। সুতরাং মাসিক তালিকার কোনো বই পছন্দ না হলে যে কোনো দু'মাসের বইএর বদলে বদলী তালিকা থেকে অন্য বই বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আপনার আছে।

বুক ক্লাব প্রথা এদেশে নতুন, সেজন্য এর নিয়মকানুন বুঝতে কোনোরকম অসুবিধা হলে দয়া করে তৎক্ষণাৎ জানাবেন, আমরা সানন্দে মনোযোগ দেবো। চিঠিপত্রের সত্বর উত্তরের জন্য সর্বদা রিপ্লাই পোস্টকার্ড পাঠিয়ে সহযোগিতা করলে বাধিত হবো।

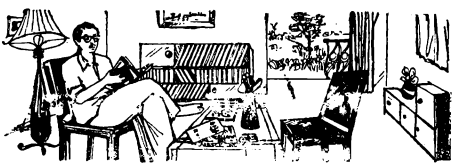

কেন আপনি 'নাইস্ বুক ক্লাব'-এর সদস্য হবেন ?

১। আপনি পাচ্ছেন মনোরম গ্রন্থ সম্ভার—প্রতিভাবান সম্ভাবনাময় জনপ্রিয় লেখকদের রচনা, পত্র-পত্রিকায় সুপ্রশংসিত, কোনটি-বা পুরস্কারপ্রাপ্ত !

২। বইগুলি দামী হলেও আশাতীত কম দামে ঘরে বসে আন্‌কোরা পাচ্ছেন !

৩। দোকানে গিয়ে সময় নষ্ট করে বই বাছাই করতে হচ্ছে না, কারণ 'নাইস্ বুক ক্লাব' পরিবেশিত প্রতিটি বই-ই বিশেষভাবে বাছাই করা !

৪। ভাল ভাল নির্বাচিত লেখকদের বই নিয়মিত কিনে নব্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার গৌরব অর্জন করছেন এবং রুচিসম্পন্ন পাঠকপাঠিকার সম্মানজনক তালিকায় আপনার নাম থাকছে !

৫। অল্প খরচে একটি মনোরম গ্রন্থাগার আপনার ঘরেই গড়ে তুলতে পারছেন !

৬। বই কিনলে আয়কর অব্যাহতি পাওয়া যায়, আপনি সেই সুযোগ নিশ্চিতভাবে পাচ্ছেন !

৭। ক্লাব কর্তৃক নির্বাচিত বইএর সঙ্গে বাজারের অন্যান্য পছন্দমতো বইও টাকায় ১০ পয়সা কম দামে কেনার সুযোগ পাচ্ছেন ক্লাবের মাধ্যমে !

৮। 'বই ব্যাপার' নামে বই-সংক্রান্ত একখানি মাসিক পত্রিকা বিনামূল্যে পেতে থাকবেন। এতে ক্লাবের আগামী মাসের বইয়ের পরিচয় দেওয়া থাকে।

নাইস্ বুক ক্লাবের

বিজয় অভিযান !

*

প্রথম আবির্ভাবের মাত্র ছ' মাসেই ক্লাবটি যেভাবে পাঠক মহলে বিস্ময় সঞ্চার করেছে, তাতে আগামী ক'মাসে এর সদস্য সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে, সন্দেহ নেই। এখনই এই ক্লাবের সদস্য ছড়িয়ে পড়েছেন সুদূর আসাম থেকে বোম্বাই পর্যন্ত !

ক্লাবের নিয়মিত সদস্যরা (অর্থাৎ যাঁরা পরপর অন্তত চার মাস বই নিয়েছেন) ক্লাবের নির্বাচিত বইএর সঙ্গে বাজারের অন্য যে কোন বই ক্লাবের মাধ্যমে টাকায় ১০ পয়সা কম দামে পাবেন। "নাইস্ বুক ক্লাব"-এর সদস্যপদ এমনি সম্মানজনক, এমনি লোভজনক !

এখনি কুপন পূরণ করে পাঠান...

নাইস্ বুক ক্লাব (অ্যাল্ফা-বিটা)

৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

আমাকে ক্লাবের সদস্য করে নেবেন। ৮০ পয়সার ডাকটিকিট রেজিসট্রেশন ফী স্বরূপ পাঠালাম। কোন্ কোন্ বই এখন পাঠাবেন, লিখে দিলাম। ডাক-খরচ সমেত ভি পি করবেন। * বই পৌঁছলেই দাম দিয়ে দেব। ছ'মাসে ছ'খানি বই কেনার প্রতিশ্রুতি দিলাম; তারপরে ইচ্ছা হলে সদস্য থাকতে পারি। এক মাস আগে জানিয়ে সদস্যপদ ছাড়তে পারি।

নাম :

ঠিকানা :

*অগ্রিম দাম পাঠালে (৭৫ পয়সা রেজিস্ট্রি ডাক খরচ সমেত) ভিপি খরচ কমপক্ষে ২০ পয়সা আপনার বাঁচে। একই অর্ডারে এক সঙ্গে ছ'মাসের বই নিতে পারলে টা ২-৭৫ ডাকখরচ বাঁচে। চেক কেবলমাত্র & Co. ক্রশ করবেন।

অ্যালফা-বিটার
বাংলা বই ও পত্রিকা

গল্প-উপন্যাস

শার্লক হোম্‌স্‌ ফিরে এলেন : কোনান ডয়াল : অনুবাদ অদ্রীশ বর্ধন

২য় মুদ্রণ ১০৲

চোর কুঠুরির আলো : 'গোরা' ৫'৭৫

ঢেউভাঙ্গা মুক্তা : আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য ৬'৭৫

মাটি ও পৃথিবী : সুখেন্দু সরকার ২'৭৫

৫টি গোলাপ একটি কুঁড়ি : সুখেন্দু সরকার ৫.২৫

কালো মাটি রাঙা মন : নবফুল ৫'৭৫

কিংবদন্তির প্রেমকথা : নবফুল ২'৫০

জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি : নারায়ণ চক্রবর্তী ৪'৫০

পিয়াসা : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ৮৲

অভিসার : অসিত চৌধুরী ৩' ৫

নতশির ঊর্মি : গ্রেগরী মুখার্জী ৫৲

হৃদয়ের স্বাক্ষর : জগদীশপ্রসাদ দাশ ৪৲

ফার্ষ্টক্লাসের যাত্রী : শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা 'শরদ'

এবং নির্মলেন্দু গৌতম ২'৫০

ঝড়ো ফুল : সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ৫৲

নেবু রায় : পল্লব রায় ৩'৫০

আর এক জন্ম আর এক আকাশ : কল্যাণ জানা ২'৭৫

তিন অঙ্কে এক অঙ্ক : রাধাগোবিন্দ দাস ৫'৫০

রকেট বই

রকেট সিরিজ উপন্যাস

গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ : মনোরঞ্জন দে ৮০ প.

ভূগর্ভে টার্জন : „ „ ৩৲

অন্ধ যে-দেশে সকলেই : „ „ ১'৭৫

রোবার হলেন আকাশরাজা : অদ্রীশ বর্ধন ১'৭৫

সমুদ্র শয়তান : অদ্রীশ বর্ধন ৪৲

ডক্টর অক্সের এক্সপেরিমেণ্ট : অদ্রীশ বর্ধন ২৲

রামধনু-রঙ মানিক : আদিত্য ভট্টাচার্য ২৲

রোমাঞ্চকর নতুন পৃথিবী : আদিত্য ভট্টাচার্য ১'৭৫

মঙ্গলের ভয়ানক রক্তমণি : শ্রীধর সেনাপতি ১'৭৫

মানুষ-জন্তুর দ্বীপে : প্রদীপ মিত্র ১'৭৫

পৃথিবীতে শিশুযুগ আসছে : গৌরীশংকর দে ১'৭৫

মরণ ঘুম : অজয় হোম ১'৭৫

চারশো পঞ্চান্ন দিন পরে : মতি মুখোপাধ্যায় ১'৭৫

অগ্নির দেবতা হেফেসটাস : ডকটর দিলীপ রায় চৌধুরী ১'৭৫

যমালয়ে ১৯৯৭ : নকুল মুখোপাধ্যায় ১'৭৫

কুমেরুর বিভীষিকা : রণেন ঘোষ ২৲

[illegible]পাতেক বেলুন চেপে : অদ্রীশ বর্ধন ২৲

কবিতা

নীলশহরের গলি : জগদীশচন্দ্র দাশ ২.৫০

কখন কুয়াশা : „ „ ৩

সন্ধ্যার জানালা : মতি মুখোপাধ্যায় ৩.২৫

এক সমুদ্র দুটি মন : শান্তিভূষণ রায় ২.৭৫

যে নদী রাত্রির : ডক্টর দিলীপ নাথ ৩

পত্রলেখা : কামাখ্যা শঙ্কর গুহ ২.৭৫

দীপশিখা দ্যুতিময় : বিনয় মিশ্র ৩

অভিজ্ঞান শকুন্তল : কালীপদ দাস পুরাণরত্ন ৫.৭৫

ফুটবে আবার ফুল : অনিল কুমার বিশ্বাস ৫

ঋষভ-গান্ধার : সত্যব্রত বসু ২.৫০

খনি খামার : বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় ৩.৭৫

তুষার থেকে সাগরে : শ্যামলবিহারী সরকার ২

আবার ভোর পেরিয়ে : অমিয়কান্তি দাশ ৪

আমরা গেঁথেছি মালা : শীলা মল্লিক সম্পাদিত ৪

প্রথম কবিতা : 'পুরুষোত্তম' ২

ছড়া

নীল ঝিল : অজয় চক্রবর্তী ২.৫০

পড়ায় কত মজা (১ম ভাগ) : তারক মিত্র ১.২৫

নাটক

মুক্তি সংগ্রাম : অজিত কুমার সেনগুপ্ত ১৲

যমালয়ে ১৯৯৭ : নকুল মুখোপাধ্যায় ১·৭৫

নতুন জীবন : অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ৪·৭৫

অমৃতস্য পুত্রা : সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৲

যুগ্ম পুষ্প ও দুই সখী : সুহাসিনী দাস ১·৫০

প্রবন্ধ, রম্যরচনা

বাঁচতে সবাই চায় : অসীম বর্ধন (২য় সং) ৩·৭৫

পূর্বপক্ষ : জৈমিনি ৪৲

ওঙ্কার কথামৃত : কিঙ্কর অজিতকুমার ৪৲

পত্র-পত্রিকা

আশ্চর্য!

(৫ম বর্ষ চলছে)

প্রধান পৃষ্ঠপোষক সত্যজিৎ রায় । বার্ষিক ১৮৲

সুখী মন

(৩য় বর্ষ চলছে)

সম্পাদক অসীম বর্ধন । বার্ষিক ৪৲

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌

মনোরম গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রকাশক

৭৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

ফোন : ৩৪-৭২৭৭

ঘুম-ঘর

রণেন ঘোষ

[এই কাহিনী ভাবীকালের। এ ভাবীকাল আমাদের জীবনে কেন আমাদের ভাবী কয়েক পুরুষের জীবনেও হয়তো আসবে কিনা সন্দেহ।

তবে ভারতের শ্বাশতঃ বাণী—'চরৈবেতি'। এগিয়ে যাও। এগিয়ে যাও। মানব সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। বিশ্বাস করি ধীরে ধীরে এক সময়ে আমাদের এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়বে গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে। মানুষের পদধ্বনি শোনা যাবে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আমাদের ভাবী বংশধরদের এই বিপুল সাফল্যে গর্বে ভরে উঠছে আমাদের বুক। মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বংশধররা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ডাক দিয়ে বলছে—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। যত পরেই হোক না কেন এমন একদিন আসবেই আসবে। আর সেই বিশ্বাসে আমাদের ভাবী বংশধরদের হাজির করলাম আপনাদের সামনে।]

*

সমুদ্রের মধ্যে এখানে ওখানে ছিটানো কয়েকটা পামগাছ। বালির হলদের বুকে সমুদ্রের ফোঁটা। মসৃণ সবুজ পাতার ওপর সূর্যের সোনাগলা আলো চিক চিক্ করে হেসে উঠছে। সমুদ্রের একটানা হাওয়ায় পাতার মধ্যে আনন্দের হিল্লোল পড়ে গেছে।

সামনে একটা পাম গাছের নিচে বহ্নি দাঁড়িয়ে। ঠিক যেন পাথরের মূর্তি। হরিণ হরিণ চোখগুলো সামনের সমুদ্রের দিকে প্রসারিত। সমুদ্রের নীল রংয়ের বুঝি ছোঁয়াচ লেগেছে চোখে।

দেখতে দেখতে দেখতে সমুদ্রের বুকে একটা কালো বিন্দু ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে এখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। শক্তিচালিত একখানা ছোট মাছধরা নৌকো হেলে দুলে ভেসে আসছে। নৌকোর এক ধারে রজত দাঁড়িয়ে। তীরের গাছপালার মধ্যে কি যেন খুঁজছে রজত।

"বহ্নি, বহ্নি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?" বহ্নির হাতে বাঁধা-রেডিও ব্রেসলেট মুখর হয়ে উঠল। রজতই বহ্নিকে এই রেডিও-ব্রেসলেট উপহার দিয়েছে প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ।

"তাড়াতাড়ি চলে এস, বহ্নি—প্রচুর মাছ ধরেছি।" হ্যাঁ, এতক্ষণে বোঝা গেল তাড়াতাড়ি আসতে বলার কারণ। মাছ গুলো নাবাতে হবে। কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। বহ্নি তাই যাবে না ঠিক করল। বেশ কয়েকবার শোনা গেল রজতের গলা। অনেক কাকুতি মিনতির পর দুষ্টুমী হাসিতে ভরে উঠল বহ্নির মুখ। বেশ জব্দ হয়েছে রজত। কিন্তু তবুও বহ্নি কোন কথা বলল না রেডিও ব্রেসলেট মারফত। শুধু আস্তে আস্তে গাছের আড়াল থেকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল বহ্নি।

রজতের নৌকো তীরে এসে লাগল। বহ্নিকে আসতে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল রজত। আদরে আদরে অস্থির হয়ে উঠল বহ্নি।

"বলো বলো—আর রাগ করবে না। কোন দিনও ছেড়ে যাবে না বলো আমাকে।"

দু'জনে মিলে নৌকা থেকে মাছগুলো নাবিয়ে ফেলল। মাছের আঁসটে গন্ধে ভোরের বাতাস ম ম করে উঠল। বহ্নি রুমাল চাপা দিল নাকে।

সত্যি অনেক মাছ। বিয়ের পর বহ্নির কোন অভাবই থাকবে না। সুখে থাকবে রজতের ঘরে।

নতুন গ্রহের এই জীবগুলো ঠিক মাছের পর্যায়ে পড়ে না। বহু লক্ষ বছর আগে এদের দেহে আঁশের আবির্ভাব ঘটেছিল। এখন সারা গায়ে শক্ত খোলার আবরণে ঢাকা। কিন্তু খুব সুস্বাদু এদের মাংস। এই গ্রহের প্রথম মানুষেরা এদের নামকরণ করেছে পৃথিবীর রীতি অনুযায়ী। পৃথিবীর কথা মনে হতে বহ্নির মনটা কেমন যেন হু হু করে উঠল। কোন দিনও সে দেখতে পাবে না মাটির পৃথিবীকে।

"কত মাছ ধরেছি বলো তো? জালটা তবুও ছেঁড়া ছিল আজকে সারতে হবে জালটা।"—বেশ গর্বের সঙ্গে বলল রজত।

কয়েক পা এগিয়ে ছোট্ট একটা গাড়ীতে উঠে পড়ল বহ্নি। বালির সমুদ্রে এই গাড়িগুলো বিশেষ উপকারী। রজত একে একে মাছগুলো তুললো গাড়ীতে। তারপর গাড়ীটাকে সজোরে সামনের দিকে ঠেলে লাফিয়ে উঠে পড়ল। বালিয়াড়ীর মধ্যে সজোরে ছুটে চলল গাড়ী। কিন্তু কিছুদূর আসতেই থামতে হলো ওদের।

নীল আকাশের গায়ে সাদা মতো কি যেন ফুটে উঠল। অবাক হয়ে দুজনে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সাদা বস্তুটার পেছন থেকে ধোঁয়ার মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে।

এবার একটা ক্ষীণ শোনা গেল। ক্রমশঃ বেশ জোর হচ্ছে। ওদের কয়েক পুরুষ এই অদ্ভুত শব্দ শোনে নি। অজানা আতঙ্কে বহ্নি শক্ত করে চেপে ধরল রজতের হাত। আকাশের অদ্ভুত বস্তুটা বেশ ভালভাবে দেখা যাচ্ছে এখন। তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দে আকাশ বাতাস ভরে উঠছে। অকস্মাৎ দিগন্তের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল বস্তুটা। চমক ভেঙে ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল। বিচিত্র এক আনন্দের হাসি ফুটে উঠল ওদের মুখে। মনে মনে একটা কথাই ধ্বনিত হলো—পৃথিবী থেকে আসছে।

প্রায় তিনশ বছর পরে মাটির পৃথিবীর কী মনে পড়ল নন্দনকে ! তিনশ বছর আগে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল নন্দনে ! আবার কে জানে কি বার্তা এনেছে মাটির পৃথিবী ?

বহুক্ষণ ধরে এই কথাগুলো মনে হল বহ্নির। কেন ! আবার কি আসবে পৃথিবী ? এই জলমগ্ন নন্দনে তো আর বসবাসের উপযোগী জমি নেই। এ কথা তো পৃথিবীর অজানা নয়। তবে ?

পাঁচশো বছর আগে মহাকাশ থেকে নন্দন গ্রহকে জরীপ করেছিল রবট স্পেশশীপ। নক্ষত্রলোক ভ্রমণে পৃথিবীর তখন হাতে খড়ি। মানুষের আগমনের আগেই ইলেক্ট্রোনিক রবট স্পেশশীপ বহুবার পাক খেয়েছে অজানা সূর্যের চার পাশে। বহু গবেষণা করতে হয়েছে মানুষকে। মৌমাছির মতো একটি একটি করে বহু তথ্য অজানা গ্রহ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিল রবট স্পেশশীপ। আর তার ফলেই সম্ভব হয়েছে অজানা নক্ষত্রলোকে মানুষের অভিযান।

সেই রকম একটি রবট স্পেশশীপের আবিষ্কার এই গ্রহ। পৃথিবীব লোক নাম দিয়েছিল নন্দন। নন্দন কানন। জলরাশি বেষ্টিত একখণ্ড জমি নিয়ে এই নন্দন। বহুদিন পরে হয়তো এই বিপুল জলরাশির মধ্যে মাথা ঠেলে উঠবে আরও অনেক দ্বীপ। কিন্তু অনেক দেরী আছে সেই অনাগত দিনের।

নন্দনকে জরীপ করতে প্রায় ১০০ বছর লেগেছিল রবট স্পেশশীপের। আর তার পর আরও ১০০ বছর লেগেছে রবট আনিত তথ্যের বিশ্লেষণ করতে। অবশ্য প্রথমে নন্দন মানুষ বসবাসের উপযোগী বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ নন্দনের দশ ভাগের নয় ভাগ জল। এরচেয়ে আরও অনেক ভালো গ্রহের সন্ধান পেয়েছিল পৃথিবী। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে প্রথম অভিযাত্রী দল পদার্পণ করেছিল। তারাই বহ্নিদের পূর্বপূরুষ। তারাই নন্দনকে মনুষ্য বাসের উপযোগী করে তুলেছে। বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল তাদের। তারা এদের নমস্য।

নন্দনের জমি খুব উর্বর। প্রচুর মাছ পাওয়া যায় এখানকার সমুদ্রে। এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। বেশ শহর কলকারখানাও গড়ে উঠেছে এখানে। নন্দনের অধিবাসীরা বেশ সুখী। নতুন নতুন উন্নতির প্রয়াস বোধহয় প্রথম দুপুরুষ পর্যন্ত ছিল। তারপর আস্তে আস্তে বিনিময়ে এসেছে ওদের উৎসাহ। তবে এখনও পৃথিবী সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল এদের।

রজতের পৌঁছানোর আগেই অনেক জল্পনাকল্পনা সুরু হয়ে গেছে। এইমাত্র খবর এল উত্তর সীমান্তে স্পেশশীপটা খুব নিচু দিয়ে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। খুব সম্ভব নামবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজছে।

"ওদের বোধহয় পুরাণো মানচিত্রটাই আছে। তা নাহলে উত্তর সীমান্তে নামবার চেষ্টা করবে কেন?" মন্তব্য করল একজন।

ইতিমধ্যে শহরের সমস্ত যানবাহন উত্তর দিকে চলতে আরম্ভ করেছে। বহ্নির বাবা শ্রীঅগ্নিশ্বর রায় এই শহরের মেয়র। তিনি নিজে মোটর হাঁকিয়ে চললেন উত্তর দিকে। বহ্নিও বাবার সঙ্গে চলল।

নানান ধরনের যানবাহনের এক বিরাট মিছিল। বিচিত্র অপরূপ দেখতে লাগছে। সামনে পথের একপাশে একটা বিরাট পাথরের ফলক মাথা উঁচু করে রয়েছে।

=নন্দনে প্রথম অভিযাত্রী দলের অবতরণ ক্ষেত্র=

১লা জানুয়ারী, '০' বছর

(২৮শে মে ২৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ)

বহ্নি মনে মনে উচ্চারণ করল এই লেখাগুলো। সকলে মনে করেছিলো এই প্রথমই শেষ। দ্বিতীয় অভিযান আর হবে না। কিন্তু...

হঠাৎ মাথা উঁচু করে অবাক হয়ে গেল ওরা সবাই। স্পেশশীপটা খুব নিচে নেবে এসেছে। কিন্তু কোন শব্দ নেই। শুকনো পাতার

মধ্যে হাওয়া যাওয়ার মতো কেবল একটানা সরসর শব্দ উঠছে। সাদা বিরাট একটা ডিমের মতো দেখতে লাগছে ওটাকে। বহ্নির মনে হলো ডিম ফুটে হঠাৎ একটা বাচ্চা বেরিয়ে আসবে। বহ্নির সমস্ত কল্পনাই অদ্ভুত।

"কত ছোট স্পেশশীপটা,"—ফিসফিস করে বহ্নিকে বলল একজন। "এটা করে নিশ্চয় পৃথিবী থেকে আসা যায় না।"

"নিশ্চয় না।" গভীর প্রত্যয়ে পাশ থেকে উত্তর দিল অন্যমত।

"এটা একটা ছোট লাইফ বোট। আসল স্পেশশীপটা অনেক ওপরে আকাশের মধ্যে আছে। প্রথম অভিযাত্রী দলের কথা ভুলে গেলে নাকি?"

"আস্তে আস্তে! ওরা নেবে আসছে!"

গভীর উত্তেজনায় সবাই অধীর হয়ে উঠল। ঐ ডিম্বাকৃতি বস্তুটার মসৃণ গা থেকে ছোট একটা দরজা খুলে গেল। কিন্তু তবুও কাউকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল না। বহ্নির চোখের পাতা পড়ছে না। অনেক কথা মনে ভীড় করে আসছে। এরা কারা? যদি পৃথিবীর লোক না হয়?

কিছুক্ষণের মধ্যে আগন্তুকেরা একে একে বাইরে বেরিয়ে এল। অজানা সূর্যের তীব্র আলোকে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কয়েক-হাত চাপা দিল চোখে। বহ্নি গুণে দেখল সংখ্যায় ওরা সাতজন। না, অতি মানবতার কোন চিহ্ন নেই ওদের মধ্যে। বহ্নি বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হলো। মনে মনে অনেক কল্পনা করেছিল সে।

আগন্তুকেরা নন্দনবাসীদের চেয়ে মাথায় বেশ উঁচু। নাক চোখ মুখ খুথ কাটা কাটা তীক্ষ্ণ। গায়ের রঙ ফরসা। পেশীবহুল ছিমছাম ওদের হাবভাব দেখে খুব হাসি পেল বহ্নির। অহেতুক ওরা ভীত সচকিত হয়ে উঠেছে।

মেয়র শ্রীঅগ্নিশ্বর রায় সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। অভ্যর্থনার

কথাগুলো সারা পথ মুখস্থ করতে করতে এসেছেন। উত্তেজনায় হাত পা বেশ কাঁপছে। একটা বিষয়ে মেয়র এখনও চিন্তা করছেন। যদি এরা পৃথিবীর লোক না হয়?

"নন্দনের পক্ষ থেকে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই। আশা করি আপনারা নিশ্চয় পৃথিবী থেকে আসছেন।"

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। ওরা কি পৃথিবীর লোক? নন্দনের ভাষা কি ওরা বুঝতে পারবে? কিন্তু সকল উদ্বেগের সমাধান করে আগন্তুকরা পৃথিবীর ভাষাতেই উত্তর দিল। আর তখুনি বহ্নির দৃষ্টি পড়ল নিলয়ের ওপর।

এক মুহূর্তে বহ্নির যেন সমস্ত কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। এ এক বিচিত্র অনুভূতি। এর আগে কোনদিন অনুভব করেনি বহ্নি। সমস্ত মনটা হঠাৎ ভয়ে উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কি অনাস্বাদিত পুলক লাগছে সমস্ত শরীরে।

নিলয় সঙ্গীদের মতো লম্বা। পেশীবহুল সুগঠিত দেহ। বড় বড় কালো চোখ। জোড়া ভ্রূর নিচে যেন নিথর কালো শান্ত দিঘী। কি যেন এক মোহময় আকর্ষণ আছে নিলয়ের চোখ দুটিতে। মধুর এক অজানা আকর্ষণ অনুভব করছে বহ্নি। বহ্নির সমস্ত দেহমন স্থান কাল পরিবেশের বাধা কাটিয়ে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হলো।

॥ ৯ ॥

আলাপ পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতে হতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সারা শরীর ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু নিলয়ের দুচোখে ঘুমের রেশমাত্র নেই। অনেক চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারল না নিলয়। কয়েক সপ্তা আগের কথা মনে পড়ল। স্বয়ংক্রিয় বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনিতে ঘুম ভেঙে যায় নিলয়ের। আর তারপর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মহাকাশ যান রক্ষার কী অসম্ভব চেষ্টা করেছে ওরা। নন্দনের মতো নিরাপদ জায়গায় অবতরণ করা যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। উঃ

কি সাংঘাতিক বিপদ গেছে। কে জানত যে এত কাছে একটা সুন্দর গ্রহ আছে। এখন অন্ততঃ একটা বিষয়ে ওরা নিচিন্ত যে মহাকাশ যান সারান না গেলেও বাকী জীবনটা নন্দনে ভালভাবে কাটাতে পারা যাবে। নাই-বা হোল তিন শতাব্দীর অভিযান সফল করা। তবু তো মহাশূন্যে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়তে হবে না। জাহাজডুবি নাবিকদের এ ছাড়া কাম্য আর কোন কিছু নেই। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার আশ্বাস।

নন্দনের বুকে এই প্রথম রাত্রি। বড় অদ্ভুত লাগছে নিলয়ের। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সারা আকাশ জুড়ে অজানা গ্রহনক্ষত্রের মেলা। পৃথিবী থেকে এত দূরেও মানুষের বসবাস রয়েছে। রিগেল নক্ষত্রের আলো কি এখান থেকেও দেখতে পাওয়া যায়। রিগেল এখনও বহু আলোকবর্ষ দূরে। নিলয়দের গন্তব্যস্থল ঐ রিগেল নক্ষত্রে। অনেক এলোমেলো চিন্তা ভীড় করে এল নিলয়ের মাথায়।

জোর করে এসব চিন্তা মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করল। মনে মনে অনেক কথাই বলল নিলয়। সুদূর নক্ষত্রের কথা ভুলে যাও। অনেক সময় পাবে ওদের কথা ভাববার। তোমার চারদিকে তাকিয়ে দেখ। পৃথিবী আর রিগেলের মধ্যে নন্দনের অস্তিত্ব হয়তো নগণ্য। কিন্তু একে তো দ্বিতীয়বার আর দেখতে পাবে না। কিছুদিনের মধ্যে তোমাকে যাত্রা করতে হবে সুদূর নক্ষত্রলোকে। দুশ বছরের মধ্যে হয়তো তোমাকে আর থামতেও হবে না······

সঙ্গীরা সবাই ঘুমে অঘোর। আস্তে আস্তে উঠে পড়ল নিলয়। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে আসলে হয়তো ঘুম আসতে পারে। ইতিমধ্যে রাতের নন্দনকেও দেখা যাবে। 'নন্দন' নামটাও কী সুন্দর। কী মিষ্টি! নন্দন! নন্দন!

ঘর ছেড়ে রাস্তায় পা দিল নিলয়। চারিদিক নিস্তব্ধ নিথর। কোন প্রাণের স্পর্শ নেই কোনখানে। দুপাশের ঘুমন্ত বাড়িগুলো প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে। ছোট্ট শিশুর মতো আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল নিলয়।

সারি সারি মাছধরা নৌকোগুলো দেখা যাচ্ছে। নৌকোগুলোর সামনে জলের সীমারেখা চিক্ চিক্ করছে। আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে গেল নিলয়।

নৌকোগুলো দেখে উৎসুক হয়ে উঠল নিলয়। কারিগরী বিদ্যার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে এ থেকে। দেখতে পাওয়া যাবে কেমন করে ওরা বশ করেছে অশ্রান্ত সমুদ্রকে।

নৌকোগুলির বহিরাবরণ শক্ত অভঙ্গুর প্লাষ্টিকের তৈরী। দুপাশে বিদ্যুৎচালিত মাছ ধরার জাল রয়েছে। বেতার যোগাযোগের জন্যে একটি করে এ্যান্টেনা আছে। নৌকোর ঠিক সামনের রয়েছে স্বয়ংক্রিয় বিদ্যুৎচালিত মোটর। এদের কারিগরী বিদ্যা বর্তমান পৃথিবী থেকে অনেক পেছিয়ে আছে ভাবল নিলয়। জটিল যন্ত্রপাতি সমন্বিত নিউক্লিয়ার জাহাজ এখন পৃথিবী সমুদ্রসম্পদ আহরণ করে। পৃথিবীতে এখন সমুদ্র তলদেশও পতিত থাকছে না। পৃথিবীর শাক সব্জি ফলমূলের প্রধান ঘাঁটি সমুদ্রের তলদেশ। সে-তুলনায় এদের এই প্রয়াস হাস্যকর। কিন্তু তবুও তো নন্দনবাসীরা সুখে আছে। হঠাৎ তার মনে হল এখানে চিরজীবনের মতো থেকে গেলে ক্ষতি কি! এই শান্ত জীবন তো সকলেরই কাম্য। কি হবে সুদূর নক্ষত্রলোকে অভিযান করে? অজান্তে এক সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল নিলয়। এ হবার নয়। হতে পারে না।

পায়ের সামনে জলের সীমারেখা। বড় বড় ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে পায়ের সামনে। প্রচণ্ড আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছে আদি-গন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। বারে বারে সে ঝাঁপিয়ে পড়ছে শক্ত বেলাভূমির ওপর। পায়ের নিচে নানান আকারে শামুক ছড়ানো। বিবর্তন-বাদের অনেক ধাপ পেছিয়ে আছে নন্দন। পৃথিবীর বুক থেকে অনেককাল আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে এই ধরনের শামুক। প্রতি গ্রহে একই জীবন লীলায় মত্ত প্রকৃতি। আরও কত গ্রহে জীবনের বিকাশ হয়েছে কে জানে! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কত গ্রহ আছে?

হলদে মিষ্টি আলোয় ভরে উঠল নন্দনের রাতের আকাশ। নন্দনের আকাশে ১নং চাঁদ সেলেনা বড় হয়ে উঠছে। সমুদ্রবক্ষে নিমগ্ন দিগন্ত রেখা থেকে অস্বাভাবিক গতিতে উঠে এল সেলেনা। সমস্ত সমুদ্র তীর আবছা আলোয় ভরে উঠল।

আর এই আলোয় নিলয় দেখল সে একা নয়। অল্প দূরে নৌকোর ওপর একটি মেয়ে বসে আছে। নিলয় মেয়েটির পেছনে আছে বলে এখনও দেখতে পায়নি মেয়েটি। কি রকম অস্বস্তি বোধ করল নিলয়। এখানকার আদবকায়দা সে কিছু জানে না। সুতরাং মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়াটা বোধ হয় উচিত হবে না। এই নিরিবিলি নির্জন সমুদ্র তীর ··না, ঘরে ফিরে যাওয়াই ভাল ভাবল নিলয়।

অকস্মাৎ মেয়েটি ঘাড় ফেরাতেই ধরা পড়ে গেল নিলয়। নিলয় বুঝল এখন পালিয়ে যাওয়া নিরর্থক।

বহ্নি মনে মনে যেন নিলয়কেই কামনা করছিল। নিলয় নিশ্চয় আসবে এখানে। এরকম চিন্তা করা অস্বাভাবিক। কিন্তু কেন জানি বহ্নি এবিষয়ে স্থির নিশ্চয় ছিল। বিছানায় শুয়েও ঘুমোতে পারেনি বহ্নি। কি এক অস্বস্তিতে ছটফট করেছে। সারাদিন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে নিলয়ের ছবি। আর ইতিমধ্যে বহ্নি নিলয় সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছে।

নিলয়দের বিশ্রামাগার আর বহ্নির বাড়ী প্রায় সামনাসামনি। মাঝখান দিয়ে কেবল রাস্তা চলে গিয়েছে। নিলয়কে দেখার জন্যে সারাক্ষণ জানলায় বসে ছিল সে। আর সেই নিলয় এখন তার মুখোমুখি। মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল ভগবানকে।

নিলয়ের মুখটাই যেন হাসি হাসি। ভাবল বহ্নি। পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় সেই হাসি এক অপূর্ব মাদকতার সঞ্চার করল।

"আপনাকে এখানে দেখতে পাব বলে ভাবিনি। আশা করি আপনাকে অসুবিধায় ফেলিনি নিশ্চয়ই।"

"না না, এরকম, এরকম কথা বলছেন কেন ?" সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল বহ্নি।

"আমি পৃথিবীর মানুষ। নন্দনের আদব কায়দা কিছুই জানি না। তাই···।" একটু হেসে বলল নিলয়।

বহ্নির কোন কিছু বলার আগেই চকিতের মত সবকিছু মনে পড়ল নিলয়ের। এই মেয়েটিকে তো সে আগে দেখেছে। এই মেয়েটিই তো অবাক হয়ে চেয়ে ছিল তার দিকে। সারাপথ বারে বারে মেয়েটি চেয়ে দেখছিল তাকে।

তবে কি ?

দুজনে নির্বাক। কোন কথা না বলে মুখ নিচু করে পায়ের আঙুল দিয়ে একমনে বালি খুঁড়ে চলেছে বহ্নি। চাঁদের আলোয় মুক্তার মতো দুএকটা বালির কণা চিক্‌চিক্ করছে। নিলয় যেন সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলেছে। অপরিচিতের গণ্ডী যেন আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী আর নন্দন যেন খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। অন্যমনস্কভাবে ওরা দুজনে সামনের নৌকোটার ওপর বসে পড়ল। মনের গভীরে কত কথাই না অনুরণিত হচ্ছে। নির্বাক মনের বোবা ভাষাই এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দুজনের সামনে।

বোধহয় অন্যায় হচ্ছে এভাবে বসে থাকা—ভাবল নিলয়। কি দরকার এখানে বসে থাকার। কি অধিকারে নন্দনের শান্ত জীবনে ঝড় ডেকে আনবে নিলয়। কিছু সময় তারা নন্দনের বুকে আশ্রয় নিয়েছে এইমাত্র। বরং ক্ষমা চেয়ে চলে যাওয়াই ভাল। নির্জন সমুদ্রতীরে এভাবে দেখা হওয়াটাই বোধহয় ঠিক নয়।

এত ভেবেও কিন্তু উঠে চলে যেতে পারল না। সামনে সমুদ্র-বক্ষে সেলেনার সম্পূর্ণ ছবি ভেসে উঠেছে। হলদে আলোয় সোনার মুকুট পোরে ঢেউগুলো উঠছে আর পড়ছে। বাতাসে জলজ গন্ধ ভেসে আসছে। এই নির্জন ঘুমন্ত নন্দনে কি এক চিরন্তন জিজ্ঞাসায় বসে আছে ওরা দুজনে।

"আপনার নাম কি?"

গলার স্বরে চমকে উঠল বহ্নি। একটু পরে বলল—"বহ্নি। বহ্নি শিখা রায়।" উচ্চারণে কেমন একটা অদ্ভুত টান আছে। নন্দনের বৈশিষ্ট্য এটা। বেশ মিষ্টি লাগে শুনতে।

"আর আমার নাম নিলয় রায়। ঐ তারার জাহাজ দেবযানের এ্যাসিস্টাণ্ট প্রপালসন ইঞ্জিনীয়ার।"—অল্প হেসে নিজের পরিচয় দিল নিলয়।

"নন্দনকে কেমন লাগছে আপনার?"

"এত তাড়াতাড়ি কি বলা সম্ভব? কিছুদিন থাকলে বলতে পারা যাবে।"

"আপনি মানে আপনারা কি অনেকদিন থাকবেন এখানে? একটু থেমে থেমে বলল বহ্নি।

এবার নিলয়ের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল বহ্নির মনোভাব। এই আশঙ্কা সে করছিল।

"ঠিক বলতে পারছি না। তবে দেবযান সারান পর্যন্ত তো থাকতে হবে।" সত্যি কথাই বলে ফেলল নিলয়।

"কী খারাপ হয়েছে দেবযানের?"

"ওহো সেটাই তো বলতে ভুলে গেছি। দেবযানের Meteor স্ক্রীনটা বড় একটা উল্কা লেগে গেছে। সুতরাং নতুন একটা Meteor স্ক্রীন তৈরী না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে এখানে।"

"এখানে কি তৈরী করা সম্ভব হবে?"

"সম্ভব হবে বলে তো আশা করি। দেবযানের কাছে মহাকাশে কয়েক লক্ষ টন জল তোলাই এখন বড় সমস্যা।"

"জল! জল কি হবে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা তাহলে প্রথম থেকেই বলছি। আপনি নিশ্চয় জানেন যে তারার জাহাজ (স্টারশীপ) প্রায় আলোর গতিতে চলে। কিন্তু এই গতিবেগ থাকা সত্ত্বেও এক নক্ষত্র থেকে

অন্য নক্ষত্রে যেতে বেশ কয়েক বছর লাগে। যেমন আমাদের লাগছে। আর এত সময় তো বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং যাত্রাপথের বেশীভাগ সময় খুব ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে থাকতে হয়। ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে থাকার সময় কিন্তু বয়সের কোন তারতম্য হয় না। এই সময় জাহাজ চালাবার ভার থাকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ওপর।"

বহ্নি মাথা নাড়ল। "নিশ্চয় জানি এসব। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা তো এভাবেই এসেছিল এখানে।"

"যাক, তাহলে জানেন দেখছি।" হাসিমুখে বলল নিলয়। "এবার আসল কথায় আসি। মহাকাশ যদি সত্যি শূন্য হত তবে এত গতিবেগ কোন সমস্যার সৃষ্টি করত না। কিন্তু মহাকাশ তো শূন্য নয়। একটি তারার জাহাজের যাত্রাপথে প্রতি সেকেণ্ডে নানান আকারে বস্তুর সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য। আর জাহাজের প্রবল গতিবেগের জন্য এই সমস্ত সংঘাতও হয় প্রচণ্ড জোরে। সুতরাং এই সংঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রত্যেক তারার জাহাজের মাইল খানেক আগে একটি করে শীল্ড রাখা হয়। সমস্ত মহাজাগতিক পদার্থগুলো এই শীল্ডের সংস্পর্শে এসে নিজেরাই ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর এই শীল্ডকেই বলা হয় মেটিয়র স্ক্রীন বা উল্কাচাদর। আচ্ছা, আপনাদের এখানে নিশ্চয় ছাতার ব্যবহার আছে?"

"থাকবে না কেন? নিশ্চয় আছে।"—বেশ জোর দিয়ে বলল বহ্নি।

"তাহলে তো আরও ভাল করে বুঝতে পারবেন। মাথার ওপর ছাতা মেলে যেভাবে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, ঠিক এই শীল্ডগুলো ছাতার মতো রক্ষা করে এই তারার জাহাজগুলোকে। আর সেই রক্ষাকারী ছাতাই আমাদের ভেঙে গেছে।"

"শীল্ডগুলো কি জল দিয়ে তৈরী হয় নাকি?"—একরাশ বিস্ময় ঝড়ে পড়ল বহ্নির স্বরে।

"হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন আপনি। আমাদের সৌরজগতে জলই

সবচেয়ে সহজলভ্য। জলকে বরফ করে শীল্ডের কাজ চালান হয়। ছাতার মতো এই শীল্ডই একমাইল আগে আগে চলে তারার জাহাজের সঙ্গে ”

বহ্নি চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল —“তাহলে ১০০ বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে এসেছেন আপনি!”

“না, ১০৪ বছর। কিন্তু মনে হচ্ছে কয়েক সপ্তাহ মাত্র। কারণ কি জানেন মিস্ রায়, ঠিক কয়েক সপ্তা আগে ঠাণ্ডা ঘরের গভীর ঘুম থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালক ডেকে তোলে আমাদের। বাকী সব যাত্রীরা এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এখানকার কোন ঘটনাই তারা জানবে না।”

“আচ্ছা, এখানে কাজ শেষ হলে রিগেল নক্ষত্রে না পৌঁছান পর্যন্ত আপনিও ঠাণ্ডা ঘরে ঘুমিয়ে থাকবেন তো?”—এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল বহ্নি।

অশান্ত সমুদ্র নিরবচ্ছিন্ন গর্জন করে চলেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে এই অশান্ত গর্জন কেমন যেন উদাস করে তোলে মনকে। নিসংগ একাকী মনে হয় নিজেকে। অব্যক্ত ব্যথা যেন গুমরে গুমরে মনের মধ্যে আছাড়ি পিছাড়ি খায়।

নিলয় ওর দিকে না তাকিয়ে মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। আর কোন বিপদ না ঘটলে আগামী দুশো বছর ঠাণ্ডা ঘরে ঘুমিয়ে থাকতে হবে।”

“দেবযানের আপনার ঘুমন্ত সঙ্গীদের জন্যে দুঃখ হয়। নন্দনের কোন কিছু জানতেও পারল না তারা।”

“ঠিক কথা বলেছেন আপনি। আমরা এই পঞ্চাশজনই দেখতে পেলাম নন্দনকে—আপনাদেরই। আর সকলের কাছে নন্দনের অস্তিত্ব খুবই নগণ্য। শুধু লগ্ বুকে লেখা থাকবে যে যাত্রার ঠিক ১০০ বছরের মাথায় দেবযান একবার নেমেছিল নন্দনে।”

নিলয় বহ্নির দিকে তাকাল। চাঁদের আলো এসে পড়েছে মুখে।

অবাধ্য হাওয়া দু'একটা চূর্ণকুন্তল নিয়ে খেলা করছে। কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয়। এই কি মোহ, ভালবাসা, ভাবল নিলয়। কিন্তু বহ্নির চোখে মুখে কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া।

"আমাদের কথা ভেবেই কি আপনি কষ্ট পাচ্ছেন মিস্ রায়?"—অকস্মাৎ প্রশ্ন করল নিলয়।

কোন কথা বলল না বহ্নি। কেমন করে নিজের মনের অবস্থা বোঝাবে নিলয়কে, সময়ের এই অসীমত্বে হয়তো কোন দাম নেই মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার। তিনশ বছরের অভিযানের মধ্যে মাত্র ১০০ বছর শেষ হয়েছে। আরও দুশো বছর এখনও বাকী। ভাবতেও বুকের মধ্যে শির্ শির্ করে ওঠে। কিন্তু হৃদয়ের কি কোন দাম নেই সময়ের কাছে?

হঠাৎ বহ্নির মনে হল রাত্রিটা বেশ ঠাণ্ডা। মনে পড়ল বাড়ির কথা, মা বাবা ভাই বোনদের কথা। বাড়ীর কথা ভাবতেও যেন আনন্দ হয়। নন্দনে তার জন্ম। নন্দনের মতো আপন আর কেউ নয়। দীর্ঘ তিনশ' বছরের কথা শুনে বেশ ভয় লাগে। না না, তার জীবনের সঙ্গে এই অভিযানের কোন সংস্পর্শ নেই। এক্ষুনি বাড়ী ফিরতে হবে।

বহ্নি উঠে দাঁড়াল। নৌকোর দিকে দৃষ্টি পড়তেই অবাক হয়ে গেল সে। কি আশ্চর্য, ওরা এতক্ষণ রজতের নৌকার ওপর বসেছিল। রজতের কথা মনে হতেই কেমন যেন নিজেকে অপরাধী মনে হল। রজতের সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এতদিন তো সে রজত ছাড়া কাউকে ভাবতে পারেনি। কিন্তু এখন। নিজের মনকে সে কী করে বোঝাবে যে এটা অন্যায়, অসঙ্গত। আস্তে আস্তে নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে সে।

"কি হলো? ঠাণ্ডা লাগছে নাকি?"—প্রশ্ন করল নিলয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করল বহ্নিকে। বহ্নির সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো। থর থর করে কেঁপে উঠল। এক অজানা উত্তেজনায় মুখর

হয়ে উঠল প্রতিটি রোমকূপ। কিন্তু পরক্ষণেই শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিল বহ্নি।

জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল সে।

"না না, কিছু হয়নি আমার! কিছু হয়নি"—উত্তেজনায় কথাগুলো জড়িয়ে গেল বহ্নির। "নমস্কার। অনেক দেরী হয়ে গেছে। এবার বাড়ী ফিরতে হবে।"

আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে গেল নিলয়। স্পর্শ করার মধ্যে অন্যায় কোথায়? তবে……।

ইতিমধ্যে বহ্নি অনেক দূর চলে গেছে। নিলয়ও দ্রুত কয়েকপা এগিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল—"আবার কি দেখা পাব?"

বাতাসের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ছাড়া আর কোন কিছু শুনতে পেল না নিলয়। বহ্নি উত্তর দিয়ে থাকলেও বাতাস শত্রুতা করল নিলয়ের সঙ্গে। আস্তে আস্তে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল বহ্নি। নারী রহস্যময়ী। Frailty, thy name is woman এই কথাই বারে বারে মনে হল নিলয়ের।

॥ ২ ॥

অনেক দূরে মহাকাশে অবস্থিত দেবযান এখন নন্দনের সমস্ত অধিবাসীদের আলোচ্য বস্তু। নন্দনের আকাশ দেবযানই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। নন্দনের আকাশে দুটো চাঁদ ছাড়া রাতের বেলা সবচেয়ে উজ্জ্বল দেবযান।

নিলয়রা ছোট ছোট দলে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। Anti-gravity স্কুটারও এদিক সেদিক যাতায়াত করছে। মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে নিঃশব্দে চলাফেরা করছে স্কুটার গুলো। নিলয়রা যেন ঠিক ভালভাবে মিশতে পারছে না। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। নন্দনের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কোন অনুষ্ঠানেই যোগ দেয়নি ওরা। ওরা অবশ্য নিজেদের অক্ষমতার কারণ বিবৃত করেছে। বলেছে শীল্ড তৈরী না হওয়া পর্যন্ত কোন বিশ্রাম নেই ওদের।

কয়েক দিনের মধ্যে অনেক যন্ত্রপাতি দেবযান থেকে নাবিয়ে এনেছে ওরা। কয়েকটা জমিও জরীপ করা হয়ে গেছে। এখানে সেখানে ড্রিল করে নন্দনের ভূস্তর পরীক্ষা করা হচ্ছে। আরও কত যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে ওদের তার ইয়ত্তা নেই। এখানকার বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও পরামর্শ করে ওরা।

প্রথম সাক্ষাতের ঠিক দুদিন পরে বহ্নি আর নিলয়ের আবার দেখা হল। বহ্নি অবশ্য নিলয়কে পেট মোটা ফোলিও ব্যাগে হাতে ঘোরা ফেরা করতে দেখেছে। কিন্তু মৃদু সম্ভাষণ ছাড়া আর কোন কথা হয়নি ওদের। একটু চাওয়া, একটু হাসিতে বহ্নি অধীর হয়ে উঠেছে। মনের গোপন কোণে এক অবদমিত কামনা ধীরে ধীরে মুকুলিত হয়ে হয়ে উঠেছে। রজত যেন এক অচেনা লোক বলে মনে হয় এখন। রজত যেন এখন দূরের মানুষ।

কিন্তু অতীতকে ভুলতে পারে নি বহ্নি অনেকবার ঝগড়া হয়েছে রজত আর বহ্নির মধ্যে। ঠিক করেছে আর কোনদিন দেখা করবে না ওরা। কিন্তু তবুও ঠিক সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় ওদের দেখা হয়েছে। ওরা জানত আর যাই হোক ছাড়াছাড়ি হবে না ওদের কোনদিনও। কিন্তু এখন? এখন বহ্নি তো জোর করে বলতে পারে না যে রজত ছাড়া আর কাউকে চায় না সে। বরং……

অনেক কথাই মনে হয়। মনে হয় সেকি দ্বিচারিণী হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, না দ্বিচারিণী একটা বিশ্রী কথামাত্র। বহ্নির কোন যোগ নেই এর সঙ্গে। বিয়ের পরিণাম যদি কুৎসিত মনোমালিন্য হয় তবে সে বিয়ে নিশ্চয় কারুর কাম্য নয়। বহ্নি বিশ্বাস করে বাজারের তরিতরকারীর মতো অপছন্দ হলে বিয়েটা ফেরত পাঠান যায় না। বিয়ের আগে যদি একজনের মনেও সামান্যতম সন্দেহ বা দ্বিধা আসে তবে সমস্ত বিষয়টা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। বর্তমানের ছোট্ট বীজ ভবিষ্যতে উপযুক্ত পরিবেশে মহীরুহ আকার ধারণ করতে বেশী সময় লাগে না। সুতরাং……

ভাবনার যেন শেষ নেই। কয়েক দিনের মাত্র আলাপ নিলয়ের সঙ্গে। নিলয়ের আচার ব্যবহারের সঙ্গে কোন মিল নেই বহ্নির। এখানকার কাজ শেষ হলেই সুদূর নক্ষত্র লোকে যাত্রা করবে নিলয়। কিসের জন্যে এত ভাল লাগে নিলয়কে ? মার্জিত ভাষায়, চাকচিক্যের জন্য বা……। হয়তো কিছুটা সত্যি আছে এর মধ্যে। কিন্তু এটাই সব নয়। কেননা আরও তো অনেক সঙ্গী আছে নিলয়ের। তাদের কয়েকজনকে তো নিলয়ের চেয়েও দেখতে সুন্দর। কিন্তু তবুও নিলয়কেই ভাল লাগল কেন ? শুধু নিলয়কে দেখামাত্র কেন মনে হয়েছে এই একমাত্র পুরুষ তার জীবনে। কেন ? কেন ?

মা বাবার কাছে মনোভাব গোপন করতে পারেনি বহ্নি। একে একে সবাই জেনেছে রজতকে বোধহয় বিয়ে করবে না বহ্নি। বহ্নি নিজেই মনের কথা বলেছে বন্ধুদের। মনের এই অবস্থা কি চেপে রাখা সম্ভব ?

সকালবেলা। বহ্নি বৈঠকখানায় বসে তার বাবার কাগজপত্র টাইপ করে দিচ্ছিল। এমন সময় কলিং বেলের আওয়াজ হোল। আগের চেয়ে এখন অনেক লোকের যাতায়াত বেড়ে গেছে। সুতরাং বহ্নি পেছন ফিরে দেখল না কে এল। বহ্নির ছোট বোন সাদর অভ্যর্থনা জানাল অতিথিকে। কিন্তু পরক্ষণেই বহ্নি চমকে উঠল নিলয়ের গলার স্বরে। টাইপ করা কাগজগুলো একে একে ঝাপসা হয়ে উঠতে লাগলো। উত্তেজনায় মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। নিজের অজান্তে হাতের কাজ গেল থেমে।

"দয়া করে মেয়রকে ডেকে দেবেন একবার ?"

"নিশ্চয় দেব মিষ্টার……।"

"নিলয় রায় এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার নিলয় রায়।"

"আপনি বসুন নিলয়বাবু। বাবাকে ডেকে আনছি আমি।"

সামনের ডিভানে বসে পড়ল নিলয়। ঘরের চারিদিকে দেখতে

দেখতে হঠাৎ নিলয়ের চোখ পড়ল বহ্নির ওপর। আর তৎক্ষণাৎ খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সারা মুখ।

"কি আশ্চর্য! আপনি এখানে কাজ করেন নাকি?

"কাজ করি না। এটাই আমার বাড়ী। আমার বাবাই এখানকার মেয়র।"—বেশ গর্বের সঙ্গে বলল বহ্নি।

নিলয় বহ্নির টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। টেবিল ওপর রাখা একটা মোটা মত বই তুলে নিল নিলয়। "পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস —সভ্যতার ক্রমবিকাশ থেকে আন্তঃনক্ষত্র যাত্রা পর্যন্ত"—বেশ জোরে উচ্চারণ করল নিলয়।

"মাত্র ১০০০ হাজার পাতায় সব লেখা হয়ে গেল। কিন্তু মিস্ রায় এই ইতিহাস তো তিনশ' বছর পুরানো হয়ে গেছে। আর ইতিমধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে পৃথিবী।"

"আমরা তো আর কোন খবর পাইনি। যদি পেতাম……" বহ্নির কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল নিলয়—"বহু বহু উন্নতি হয়েছে। সে সমস্ত লিখলে ৫০টা লাইব্রেরী ভর্তি হয়ে যাবে তবে আমাদের কাছেও অনেক সংবাদ আছে। কিন্তু তাতেও ১০০ বছর পিছিয়ে থাকবে নন্দনের ইতিহাস।"

অনেক কথা দুজনের মনে ভিড় করে এল। বহ্নির মনে তোলপাড় করছে একটি মাত্র কথা। "আবার কবে দেখা হবে?" কিন্তু একথা কি মুখ ফুটে বলা যায়!

কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়র শ্রীঅগ্নিশ্বর রায় ঘরে ঢুকলেন।

"আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে আমি দুঃখিত নিলয়বাবু। আমি এইমাত্র প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বললাম। উনি বিকেলে এখানে আসছেন। যাক, কি দরকার বলুন তো আপনি?"

বহ্নি আবার কাজের মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সাদা কাগজের বুকে একই কথা বারংবার ছাপা হতে লাগলো। মনপ্রাণ উন্মুখ হয়ে উঠল নিলয়ের কথা শোনার জন্যে।

নিলয় ক্যাপ্টেনের বক্তব্য পেশ করল। যন্ত্রপাতি সম্পর্কীয় জটিল কথাবার্তার অনেক কিছুই বুঝলো না বহ্নি। তবে একটা বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে বুঝল বহ্নি যে দেবযানের লোকেরা এখান থেকে মাইল খানেক দূরে কোন কিছু করতে চায়। আর তারই অনুমতি নিতে এসেছে নিলয়।

"নিশ্চয়ই!" বললেন অগ্নিশ্বর রায়। গলার স্বরে বিনয়ের আভাস। "যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই তৈরী করতে পারেন আপনারা। কিন্তু কি করতে চান বলুন তো?"

"ওখানে গ্র্যাভিটি ইনভার্টার বসাবো আমরা। আর সেই জন্যে জেনারেটারগুলো মাটির নিচে শক্ত পাথরের ওপর বসাতে হবে। বেশ জোর শব্দ হয় মেসিন থেকে। কিন্তু এতদূরে মনে হয় কোন ব্যাঘাত ঘটাবে না।"

"ঠিক আছে। সমস্ত রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত আমরা। আচ্ছা, আপনি ক্যাপ্টেন বোসকে বলবেন যে প্রেসিডেণ্ট আজ বিকালে এখানে আসবেন। আমি অবশ্য গাড়ী পাঠাব ক্যাপ্টেনের জন্যে।"

ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল নিলয়। অগ্নিশ্বর রায় মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন। টাইপ করা কাগজটা চোখের সামনে তুলে ধরতেই সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। ভুল টাইপে ভরা সমস্ত কাগজটা।

"খুব সুন্দর ছেলেটি, না? কিন্তু অতিরিক্ত কোন কিছু ভাল নয়।"

"আমি, আমি তো তোমার কথা বুঝতে পারছি না বাপী?"

"শোন বহ্নি, আমি তোমার বাবা বলেই এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকতে পারি না।"

"না না, তুমি যা ভাবছ সব মিথ্যে। মিথ্যে।"

"সত্যি করে বলতো মা, ওকে কি তোর ভাল লেগেছে।"

"জানি না, জানি না, জানি না।" ঘাড় নিচু করে বসে রইল বহ্নি। সমস্ত শরীরটা থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

॥ ৩ ॥

সাংঘাতিক এক সমস্যায় পড়ে গেছে রজত। রজত কেন, সকলেই জানে বহ্নি রজতকে ভালবাসে। ওদের বিয়ের সবকিছু পাকাপাকি হয়ে আছে। নিলয় নন্দনের বাসিন্দা হলে এত ভাবত না রজত। এ সমস্ত লোকদের উচিত শিক্ষা দিতে জানে সে। একে নিলয় পৃথিবী থেকে আসছে তারপর সে নন্দনের মাননীয় অতিথি। সুতরাং কেমন করে নিলয়কে বলা যাবে যে বহ্নি আমার ? তোমার দৃষ্টি দিও না ওর ওপর। কিন্তু কি করা যায় এখন ?

গভীর সমুদ্রে নৌকোয় একা থাকলেই এইসব চিন্তা মাথায় ঘোরে রজতের। কিন্তু আইনতঃ কোন জোর নেই রজতের। বহ্নির ওপর তার দাবী তো অতীতের স্মৃতিচারণায়, মনের দিক দিয়ে। এখন বহ্নি যদি বলে, না, তোমার চিন্তা মিথ্যা। আমি তোমায় ভালবাসি না। তবে ? কী অধিকারে সে দাবী করবে বহ্নিকে ? ইদানীং নিলয়ের সঙ্গে খুব ঘোরাফেরা করে বহ্নি। অন্ধ আক্রোশে জ্বলতে লাগল রজত।

সেদিনকার সভার সমস্ত কিছু জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠছে চোখের সামনে। আর সেই সভার পর থেকে মরীয়া হয়ে উঠেছে রজত।

নাচগানে রজতের দক্ষতার কথা এখানকার সবাই জানে। রজত কিন্তু সে রাত্রে কোন সুযোগ পেল না। নিলয় সারাক্ষণ পৃথিবীর আধুনিকতম নাচগান বিশ্লেষণে ব্যস্ত রইল। নিলয়ের কাছে আধুনিকতম হলেও বর্তমান পৃথিবীর চোখে ১০০ বছরের পুরাণো এই নিদর্শনগুলো। রজতের কিন্তু একদম ভাল লাগে নি। মনে হয়েছে নাচ তো নয় যতসব বিকৃত অঙ্গভঙ্গি। বহ্নি কিন্তু খুব মনোযোগের সঙ্গে রপ্ত করলো এই নাচগুলো ! এই দেখে আরও জ্বলে উঠল রজত।

সভারম্ভে ক্যাপ্টেন বোস বললেন—"বন্ধুগণ, আপনাদের আন্তরিক আতিথেয়তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কোনদিনও আমরা আপনাদের ভুলতে পারবো না। নন্দনে বেশীদিন থাকতে পারবো না বলে খুব দুঃখ হচ্ছে আমার।"

"দুর্ঘটনার জন্যে আর কোন দুঃখ নেই আমাদের। কারণ দুর্ঘটনা না ঘটলে এখানে আসা হতো না। আর না আসলে নন্দনের সুন্দর অভিজ্ঞতাও হতো না আমাদের। আপনাদের দেখে আরও উৎসাহিত হচ্ছি আমরা। অনেক কিছু শিখলাম আপনাদের কাছ থেকে। আর এক নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে এখানকার অভিজ্ঞতা অনেক সাহায্য করবে আমাদের। নন্দনের মতো আর এক নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবো আমরা।

"চলে যাওয়ার আগে আর এক কর্তব্য আছে আমাদের। আমাদের মাইক্রোটেপে পৃথিবীর প্রচুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংবাদ আছে। সেগুলো দিয়ে যেতে চাই আপনাদের। আর ফলে নন্দন আরও তিনশ বছর এগিয়ে যাবে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সভ্যতায়। নন্দনের সমস্ত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের আগামীকাল দেবযানে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের মাইক্রোটেপ থেকে যত খুশী কপি করে নিয়ে আসতে পারবেন।

"আজকে আর জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা নয়। পৃথিবীর আরও আধুনিবকতম সম্পদ আছে। পৃথিবী এ বিষয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। আপনাদের পূর্বপুরুষদের এই ঐতিহ্যের নমুনা কিছু শুনুন। শুনুন মানব সভ্যতার অগ্রগতির গান।"

সভাগৃহের সমস্ত আলো কমে এল আস্তে আস্তে। সুরু হল যন্ত্রসঙ্গীত। নন্দনে অভূতপূর্ব এই মূহূর্ত। সঙ্গীতের সুরমূর্ছনায় তন্ময় হয়ে গেল বহ্নি। অসীম মহাকাশে গতিহীন সময় যেন ঝুলে রইল নির্দেশ অপেক্ষায় পারিপার্শিকতার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল বহ্নি। নিজের অজান্তে নিলয়ের একটা হাত বহ্নি তুলে নিল নিজের হাতে।

তুলনাহীন এ সঙ্গীত। এর কোন খোঁজ আগে পায়নি বহ্নি। এ সঙ্গীত কেবল একান্ত পৃথিবীর সম্পদ! মৃদু ঘণ্টাধ্বনি যেন ধীরে ধীরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্রমেই উঠছে উর্ধপানে। যন্ত্রসঙ্গীতের পার্থিব

সমস্ত কিছু যেন রূপ পরিগ্রহ করছে। সৈন্যরা মার্চ করে যাচ্ছে। কুল কুল ধ্বনি নদীতে নৌকা ভেসে চলেছে অজানার পানে। আবার কোন সময় মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ বেদনা যেন গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে। পরক্ষণেই শোনা গেল অশ্রান্ত সমুদ্রের গান। নক্ষত্রলোকে তারার জাহাজের শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো। পাথরের মূর্তির মতে নীরবে শুনলো বহ্নি। এ সঙ্গীত নন্দনের নয়। এ সঙ্গীত দূরের পৃথিবীর। লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের মাটির পৃথিবী যেন মূর্ত হয়ে উঠল সবাকার মনে। বহু দূরের পৃথিবীর সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠল আকাশ মাটি জলস্থল সর্বত্র। সঙ্গীতময় হল নন্দন।

ধীরে ধীরে থেমে এল সঙ্গীত। নিঃশব্দে সভাভঙ্গ হল। স্তব্ধ বাক্যহারা সবাই। বহ্নি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যেতে পারল না। সঙ্গীতের সুর মূর্ছনায় মোহিত হয়ে গেছে তার অন্তর। রাত্রি গভীর হয়ে এল। দূরের বনের গাছপালার এক অপার্থিব শব্দ ভেসে আসছে। নিলয়ের হাত বহ্নির কটি বেষ্টন করে রয়েছে। নিলয়ের বুকে মাথা রাখল বহ্নি। দুই দেহের অস্তিত্ব এক হয়ে মিশে গেল। মোহময় রাত্রি বহ্নিকে তার বহুআকাঙ্খিত মুহূর্ত এনে দিল। দুষ্ট মেয়ের মতো দূর আকাশে ছোট বড় নক্ষত্র মিট্‌মিট্‌ করছে। বহ্নির সমস্ত অনুভূতি একে একে লোপ পেল। মনের আকাশ এখন নির্মেঘ। কোন দ্বিধা দ্বন্দ্বের স্পর্শ নেই সেখানে। মনের অসীম আকাশে একমাত্র সূর্য নিলয়। সেই প্রখর সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় রজতের অস্তিত্ব একেবারে মুছে গেল।

॥ ৪ ॥

নিলয়ের কাছে এই প্রেমের গভীর কোন মূল্য নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় রিগেল নক্ষত্রে পৌঁছে নন্দনকে বোধহয় স্বপ্ন বলে মনে হবে। সে তো ভালবাসতে চায়নি। বহ্নিই তাকে এক অদম্য বল্গাহীন ভালবাসার জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে

চলেছে। নিলয় শুধু ফেসে চলেছে স্রোতের টানে। বাধা দেবার সমস্ত ক্ষমতা যেন লোপ পেয়েছে একেবারে।

আজকাল কাজ থেকে ছুটি পাওয়া মাত্র নিলয় আর বহ্নি দূরে বেড়াতে চায়। মানুষের যাতায়াত খুব কম সেখানে। শুধু রোবট চাষীরা নিঃশব্দে জমি চাষ করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহ্নি পৃথিবী সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন করে। কিন্তু দেবযানের গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত থাকে বহ্নি। নিলয় বলে পৃথিবীর কথা। বহ্নি অবাক বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে শোনে ওর পূর্বপুরুষদের প্রিয় জন্মভূমির কথা।

পৃথিবীতে শহরের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে শুনে খুব মনোক্ষুণ্ণ হলো বহ্নি। পৃথিবীর বিকেন্দ্রীয় সভ্যতার কথা সবিস্তারে বলল নিলয়। সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এখন মানব সভ্যতা। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, দিল্লী, কলকাতা, চণ্ডীগড়ের কথা অনেক বইতে পড়েছে বহ্নি। মানসচক্ষে ভাসছে শহরগুলোর ছবি। বহ্নি বিশ্বাস করতে পারে না যে এই শহরগুলোর এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। আর সেই সঙ্গে আমূল পরিবর্তন হয়েছে জীবন ধারণ পদ্ধতির।

"আমরা যখন পৃথিবী ছেড়ে আসি," বলল নিলয়, "তখন সবচেয়ে বেশী জনসংখ্যা ছিল বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে। যেমন অক্সফোর্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। এদের মধ্যে কোন কোনটার জনসংখ্যা ছাত্র অধ্যাপক প্রভৃতি মিলিয়ে ৫০ হাজারের ওপর ছিল। এর অর্ধেক জনসংখ্যাও তখন কোন শহরে দেখা যেত না।"

"কিন্তু কেন—কেমন করে এসব হলো?" বহ্নির স্বরে অকৃত্রিম বিস্ময় ঝরে পড়ল।

"না, কোন একটা নির্দিষ্ট কারণকে এর জন্য দায়ী করা যায় না। তবে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, সংবাদ আদানপ্রদানের অকল্পনীয়

[এরপর ১৪০ পৃষ্ঠায়]

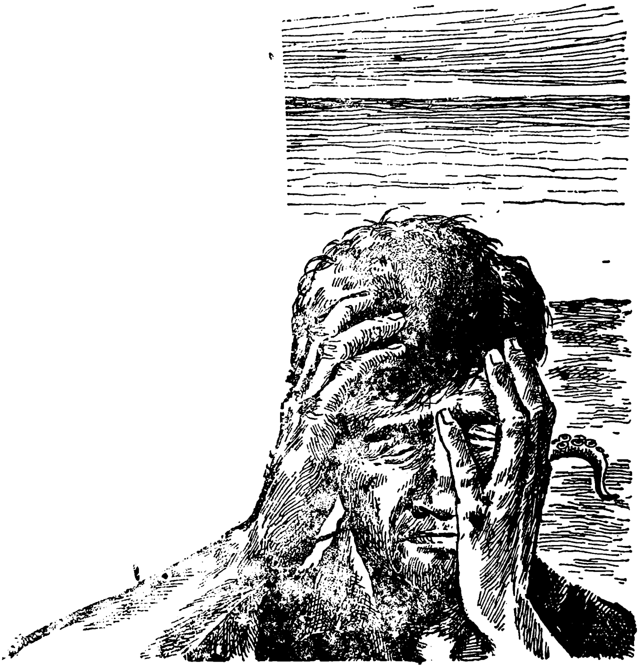

দেওয়ালের দরজা

অনাময় চট্টোপাধ্যায়

আপনারা যখন এই লেখা পড়বেন তখন হয়তো ভাববেন যে 'আশ্চর্য!'র পাতায় প্রকাশিত আরও অনেক গল্প উপন্যাসের মতো এটাও একটা মনগড়া কাহিনী। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা আমি আপনাদের বিশ্বাস করতে বলবো না—হয়ত দিনের প্রখর আলোকে এই কাহিনী পড়লে আমিও হেসে উড়িয়ে দিতাম কিন্তু এ ঘটনা আমি শুনেছি দিবাকর গোস্বামীর নিজের মুখে। সেদিনের সেই বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায়, পাহাড়তলীর প্রায়-অরণ্য অঞ্চলে বসে হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় দিবাকর আমাকে যা বলেছিল আমি সেটা অবিশ্বাস

করতে পারিনি। বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না, বিজ্ঞান যা মানতে চায় না—যে ঘটনা বিশ্বাস করা না করার ভার আমি আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

সেদিনটা ছিল বর্ষাশেষের একদিন। যাই যাই করেও বর্ষার মেঘ যেন পাহাড়তলীর মায়া কাটাতে পারছে না। দূরে পাহাড়ের উপর সভ্য জগতের আলোয় ঝলমল বিলাসনগরী ম্লান হয়ে গিয়েছিল বৃষ্টির ধারায়। গাছের পাতায় পাতায় হাল্কা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছিল এক অদ্ভুত সিপ সিপ আওয়াজ। প্লাষ্টার করা বাঁশের চাটাইয়ের ঘরে বসে দিবাকর তার ভাবগম্ভীর গলায় বলে চলেছিলো তার জীবনের গোপনতম রহস্য।

"জীবনে মিথ্যা কথা খুব কমই বলেছি। মনগড়া কাহিনী রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বাস কর অরবিন্দ—আমায় তুমি বিশ্বাস করো আজ তোমাকে যা বলবো তা একেবারে সত্যি ঘটনা। একেবারে সত্যি। নিজের জীবন দিয়ে এ সত্য আমি উপলব্ধি করেছি।

আমার এখনও মনে আছে। তখন আমি স্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্র। কোন নামকরা ব্যক্তি মারা যাওয়ার জন্য সেদিন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গিয়েছিল স্কুল। বাড়ি ফিরে চলেছিলাম আমি। হঠাৎ মনে হোল চেনা রাস্তা দিয়ে তো রোজই বাড়ি যাই, আজ একটু ঘুরে যাবো। নানা গলি ঘুঁজির মধ্যে ঘুরে ঘুরে যখন আমি প্রায় পথ হারিয়ে ফেলেছি তখন দেখি আমার সামনে একটা চওড়া রাস্তা, তার দুধারে দোকানের সারি। কেমন যেন মনে হ'ল এ রাস্তা আমার খুব পরিচিত। এগিয়ে চললাম। বাঁদিকে সাদা পাঁচীল কতদূর চলে গিয়েছে জানি না। চোখে পড়লো সেই সাদা দেওয়ালের গায়ে একটা সবুজ দরজা। একটু ইতস্ততঃ করলাম আমি। প্যান্টের পকেটে হাত পুরে দিয়ে শিষ দেবার একটা অক্ষম প্রচেষ্টা করলাম, যথেষ্ট সাহস আনবার জন্য। তারপর কি ভেবে দরজা ঠেলে ভিতরে

ঢুকবার চেষ্টা করলাম। দরজা খোলাই ছিলো। ভেতরে যেতেই ভেসে এলো ফুলের মিষ্টি সুগন্ধ। লাল কাঁকর বিছানো একটা সরু পথ চলে গিয়েছে এঁকে বেঁকে। দুপাশে সবুজ ঘাসের কেয়ারী। বড় বড় ইউক্যালিপ্টাসের ছায়ায় হেঁটে যেতে যেতে মনে হ'ল এ সবই যেন আমার অনেক দিনের চেনা। একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি রাস্তাটা শেষ হয়ে গিয়েছে একটা বাগানে। দুটো বড় বড় চিতা বাঘ বসে রয়েছে রাস্তার দুপাশে। আশ্চর্য! আমার কিন্তু একটুও ভয় করলো না। তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাদের মাথা চাপড়ে আদর করলাম একটু। ওরাও মাথা পেতে গ্রহণ করলো আমার সস্নেহ আদর। নানা রকম নাম না জানা ফুলে সাজানো বাগান! বাগানের মাঝখানে একটা ছোট ঝরণা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে ঝির ঝির করে। হাওয়া ঘেরা, ফুলের গন্ধে ভরা সবুজ ঘাসে ছাওয়া লনের ওপর দিয়ে যেতে আমার সমস্ত অন্তর যেন আকুল হয়ে উঠলো। আমার মনে হ'ল আমি যেন নিজের বাড়িতে ফিরে এলাম। এই আমার বাড়ী যেখানে নেই বিমাতার দৈনন্দিন তাড়না, নেই বাবার ভ্রূকুটি কুটিল চোখ রাঙানী!

আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

আমি আমার মাকে জ্ঞানতঃ দেখিনি। তাঁকে আমি হারিয়েছিলাম অনেক ছোটবেলায়। তাঁর কোন ছবিও আমাদের বাড়িতে নেই তবুও ঝরণার ধারে যে ভদ্রমহিলা বসে ছিলেন তাঁকে দেখেই আমার মনে হ'ল ইনিই আমার মা। দৌড়ে গিয়ে তাঁর কোলে মাথা গুঁজলাম। আমার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমার মা আমাকে আদর করলেন; তারপর একখানা বই দিলেন আমার হাতে।

বইটার পাতা উল্টিয়েই আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। একী! এ যে আমার জীবনের ছবিই আঁকা রয়েছে প্রতি পাতায়। আকুল আগ্রহে আমি পাতা উল্টিয়ে চলি। আমার জীবনের প্রতি খুঁটি নাটি ঘটনা

আঁকা রয়েছে পাতায় পাতায়। একটা পাতা চোখে পড়লো। এই তো আমি বারো বছরের আমি দাঁড়িয়ে আছি সাদা দেওয়ালের গায়ে সবুজ দরজার সামনে। এক হাতে বইখাতা ধরা। আরেকটা হাত প্যান্টের পকেটে। শিস্ দেবার একটা অক্ষম প্রচেষ্টা। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম 'তারপর'। আমার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিলেন ভদ্রমহিলা। হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেলো সেই আশ্চর্য বাগান। আমি দাঁড়িয়ে আছি রাস্তায়। দুধারে দোকানের সারি। সাদা দেওয়ালের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। চিহ্ন নেই তার গায়ে সবুজ দরজার।

যেদিন বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে গিয়েছিলো অনেক। বিমাতার কাছে মার আর বাবার কাছে রোজকার মতো বকুনী খেলাম কিন্তু কাউকেই বলতে পারলাম না কি কারণে আমার দেরী হয়েছিলো। এক অবর্ণনীয় পুলকে সমস্ত সত্তা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো। পর দিন স্কুলে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে এ কথা আমি বলেছিলাম, তারাও বিশ্বাস করে নি। তারা দেখতে চাইলো সেই সাদা দেওয়ালে ঘেরা বাগান আর সেই সবুজ দরজা। খুঁজে বার করতে আমি পারিনি। অনর্থক তাদের হয়রান করায় এবং মিথ্যা গল্পকে সত্যি বলে চালাবার অপরাধে প্রচণ্ড মার খেয়েছিলাম তাদের হাতে। সেই প্রথমবার।

দ্বিতীয়বার সেই দেওয়ালের দেখা আমি পেয়েছিলাম পাটনায় তখন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি আমি। একটু দেরী হয়ে গিয়েছিলো তাই রিক্সাওয়ালাকে বলেছিলাম তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে। বড় রাস্তায় ভীড় বেশী বলে সে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলো গলি দিয়ে। হঠাৎ মনে হ'ল এ রাস্তা আমার চেনা। অতি পরিচিত এই দুধারের দোকানের সারি। উদগ্র আগ্রহে আমি তাকিয়ে ছিলাম রাস্তার দিকে। এই তো সেই দেওয়াল। ঐ যে সেই সবুজ রংয়ের দরজা। চীৎকার করে রিক্সাওয়ালাকে থামতে বলতে

গিয়েও পারলাম না। দেরী হয়ে গিয়েছে আমার। পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে যাবে। কি জানি কেন আমার মনে হ'ল এ দরজা আমার ক্ষতি করতে চায়। তবে সেদিন দেরী আমার হয়নি। সেই পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়ে আমি ইউ, কে, স্কলারশিপ পেয়েছিলাম, তা তো তুই জানিস।

এরপর আবার সেই দেওয়ালের গায়ের দরজা দেখা আমি পাই ইংলণ্ডে। পরীক্ষায় ভাল ভাবে পাশ করার পর যখন আমি বাড়ি ফিরে আসবার ব্যবস্থা করছি তখন একটা ফার্মের একজন ডাইরেক্টর আমাকে ডেকে পাঠান। ভারতবর্ষে তাঁদের একটা ব্রাঞ্চ খোলা হবে। আমাকে তাঁরা মনোনীত করেছেন তারই সেলস ম্যানেজার পদের জন্য। এ রকম একটা সুযোগ পাওয়া খুবই কষ্টকর বিশেষতঃ আমার যখন এ কাজের জন্য উপযুক্ত অভিজ্ঞতা নেই।

টিউব ষ্টেশন থেকে হেঁটেই যাচ্ছিলাম ডিরেক্টরের অফিসে। একটা মোড় ফিরতেই আমি এসে পড়লাম সেই পরিচিত রাস্তায়। রাস্তার বাঁদিকে সারি সারি দোকান, ডান পাশে একটা সাদা দেওয়াল বহুদূরে চলে গিয়েছে। তার মাঝখানে একটা সবুজ রঙের দরজা—পরিচিত—অতি পরিচিত সেই দরজা। আমি কিন্তু দাঁড়াইনি। সোজা চলে গিয়েছিলাম ডাইরেক্টরের অফিসে এবং মনোনীতও হয়েছিলাম ঐ পদের জন্য। বারবার দেখে এসেছি যখনই কোন সুযোগ সুবিধা আমার হয় তখনই বাধার মতো দাঁড়িয়ে থাকে ওই দেওয়াল কিন্তু প্রলোভিত না হ'লে বরাবরই আমার ভাল হয়েছে।

গতকাল শেষবারের মত আমি দেখা পেয়েছি সেই দরজার। ইম্পর্টেণ্ট ডীল করবার জন্য যাচ্ছিলাম আমার একজন মক্কেলের কাছে। এক প্রতিদ্বন্দ্বি ফার্মের হাত থেকে যদি আমি ডীলটা ছিনিয়ে আনতে পারি তাহলে আমাকে জেনারেল ম্যানেজার করে দেবেন ফার্মের ডাইরেক্টরেরা আমাকে তা বলেছিলেন। সেই কাজেই যাচ্ছিলাম আমি—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর তখনই দেখা

পেয়েছিলাম আমি সেই দেওয়াল আর দরজার—শেষ বারের মতো। আমি থামিনি। ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার হতে হবে আমায়, আমাকে কি ওসব যাতা সেন্টিমেণ্ট নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? ডীল কমপ্লীট করেছি আর কর্তারাও নিশ্চয় তাঁদের কথা রাখবেন। তুই আমার একমাত্র বন্ধু তাই তোর কাছে ছুটে এসেছি এ কথা জানাবার জন্য। আমি জানি পৃথিবীতে একমাত্র তুই-ই আমার কথায় বিশ্বাস করবি। জীবনে প্রতিষ্ঠা আমি পেয়েছি—পেয়েছি নাম যশ ও অর্থ। কিন্তু জীবনের সুখ ও শান্তিকে আমি হারিয়েছি চিরদিনের মতো—হারিয়েছি আমার স্বপ্নলোকের চাবি।"

দিবাকর চুপ করেছিল। বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে। দূর হতে ভেসে আসছিল মালগাড়ীর শান্টিং করার আওয়াজ আর ব্যালাষ্ট আনলোড করার একঘেয়ে কর্কশ শব্দ। ব্যাঙের ডাকে মুখর হয়ে উঠেছিল পাহাড়ী রাত। টেবিলের ওপর থেকে টর্চ আর চেয়ারের পিঠ থেকে রেন কোটটা তুলে নিতে নিতে বলেছিলো দিবাকর —ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপরেই আমার গাড়ী পার্ক করা আছে। এটুকু রাস্তা আমি একলাই চলে যেতে পারবো।

সামনেই পড়ে আছে আজকের স্থানীয় খবরের কাগজ। প্রথম পাতাতেই বড় বড় করে ছাপা হয়েছে বিখ্যাত বৃটিশ ফার্মের উদীয়মান কর্মচারী শ্রীদিবাকর গোস্বামীর মৃত্যুবার্তা। খবরে প্রকাশ, লেবেল ক্রশিংএর কাছেই একটা ডীপ কালভার্ট তৈরী করছিলো রেলওয়ে ওয়ার্কারেরা। পাছে রাতের অন্ধকারে কেউ তাতে পড়ে যায় তাই চুনকাম করা সাদা শ্লীপারের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিলো সে যায়গাটা। কর্মচারীদের যাওয়া আসা করবার পথে যে সবুজ রংয়ের দরজাটা ছিলো সেটা তালা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলো তারা গত রাত্রে। রাতের অন্ধকারে সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে প্রায় তিরিশ ফুট নীচু নালায় পড়ে গিয়ে প্রাণ হারায় দিবাকর

গোস্বামী। যদিও জীপ ছেড়ে কেন যে ঐ দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিলো তা কেউ জানে না।

কিন্তু সত্যিই কি এটা একটা এ্যাকসিডেণ্ট মাত্র! বৃষ্টিঝরা রাত্রে টর্চের স্তিমিত আলোয় হুইস্কীর নেশা জড়ানো চোখে ঐ সাদা দেওয়াল কি জাগিয়ে তুলেছিলো দিবাকরের মনে আরেক সাদা দেওয়ালের স্মৃতি? ঐ সবুজ দরজা কি মনে পড়িয়ে দেয়নি তার স্বপ্নলোকের কথা! এ প্রশ্নের উত্তর আজ পাবো না। আমরা ভাবি জ্ঞান থেকে অজ্ঞানের—জীবন থেকে মৃত্যুর জগতে চলে গিয়েছে দিবাকর গোস্বামী। *

---

* বিদেশী ছায়ায়

আশ্চর্য !

৪নং সুলভ খণ্ড বেরুলো!

দাম পাঁচ টাকা

প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ!
পঁচিশ টাকা দামের আটখানি উপন্যাস,
চল্লিশটি শংকা ও শিহরের বিচিত্র গল্প!

অ্যাল্ফা-বিটা

এ রকম হবে জানলে কি অসবর্ণ বিয়ে করার জন্য
ভবিষ্যতের গর্ভে যেতে চাইত ওরা ?

২৫০১ সালে অসবর্ণ বিয়ে

অরুণাংশু ঘোষ

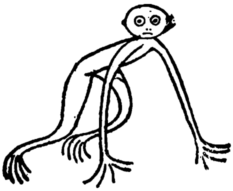

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধু কৃত্তিবাস পত্রনবীশের বৈঠকখানায় বসেছিলাম। কৃত্তিবাস বেঁটেখাটো, রোগাপটকা লোক। তাই যেন অনেকটা জেদের বশেই নামের পেছনে একটার পর একটা লেজুড় জুড়ে এক গোটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ ভর্তি করে ফেলেছে। বর্তমানে সে নানান গবেষণায় মত্ত।

তার গবেষণার শেষতম অবদান একটি কাল-পরিব্রাজক যন্ত্র। বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী যাঁরা পড়ে থাকেন, তাঁরা এতে খুব একটা চমকাবেন না, কারণ ওয়েল্‌স-এর পর "টাইম মেশিন" নিয়ে প্রচুর লেখা হয়ে আসছে। তবে কৃত্তিবাসের আবিষ্কার যে পৃথিবীতে হৈ চৈ ফেলে দেবে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত। কেননা পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি টাটকা আবিষ্কার।

এ আবিষ্কারের খবর এখনো বাহিরের কাউকে জানানো হয়নি। তবে এ সম্পর্কে কিছু খবর বাইরে বেরিয়েছে। এবং লোকে সেটি গুজব, তাই কাফের মুখে মুখে যে তা অনেক দূর ছড়িয়েছে তার প্রমাণ পেলাম সেদিন কৃত্তিবাস বৈঠকখানায়।

অনেক চেষ্টার পরেও লোভ সামলাতেও না পেরে একটা সিঙ্গাড়া

খেয়ে কৃত্তিবাস যখন কাপে একটু যোয়ানের আরক ঢালছিল, তখন সামনের দরজা ঠেলে একজোড়া তরুণ-তরুণী প্রবেশ করলো। তরুণটির চেহারায় রাগী সর্বহারা বিদ্রোহের ভাব। ভালো করে লক্ষ্য করলে একটু গোবেচারা বলেও মনে হয়।

তরুণী একটি পরমাণু বোমা।

সে-ই কথাবার্তা শুরু করলো।

কৃত্তিবাস অবাক হয়ে চোখ কপালে তুলে আদ্যোপান্ত শুনে গেলো। আমি প্রথম ধাক্কায় ভেবেছিলাম, পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে, একটু পর বুঝলাম পাগল নয়, প্রেম।

জানা গেল ছেলেটি ফিলসফিতে এম. এ পাস করে থিসিস্ করছে. মেয়েটি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে সদ্য সদ্য স্নাতক হয়ে বেরিয়েছে। পরস্পর……ইত্যাদি। কিন্তু গার্জেনরা বেঁকে বসেছেন। ছেলেটি বললে, আমাদের সেই উদার ভবিষ্যতের গর্ভে রেখে আসুন সার। যেখানে টেলি-কম্যুনিকেশন আর ফিলসফিতে বিরোধ নেই, পৃথিবী যেখানে উদার, সাম্যবাদ যেখানে প্রতিষ্ঠিত।

অনেক তর্কবিতর্কের পর কৃত্তিবাস রাজী হলো। মেয়েটির যুক্তিই তাকে পেড়ে ফেললো। উন্নত পৃথিবী দেখার চেয়ে, মেশিনটি সম্পর্কেই তার আগ্রহ বেশী।

স্থির হলো তার পরদিন বৃহস্পতিবার কৃত্তিবাস তাদের নিয়ে ভবিষ্যতের গর্ভে ছেড়ে দিয়ে আসবে। ২৫০১ সালে। বৃহস্পতিবার বলে খুঁৎ খুঁৎ করেছিলাম, কিন্তু ওরা তিনজন এমন অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে তাকালো যে যে সঙ্গে সঙ্গে যাদের পাঁঠা তাদের জবাইয়ের ভার ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

বৃহস্পতিবার নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে কৃত্তিবাসের ওখানে যেতে পারিনি। তার পরের দু'দিনও না। গেলাম সেই রোববার।

কৃত্তিবাস বৈঠকখানায় বসে ছিল। মুখে দুশ্চিন্তা, হাতে চুরোট।

ওদের ছেড়ে দিয়ে এলে হে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। খুব খুশী তো দু'জনে?

বলতে পারলাম না, কৃত্তিবাস জানালো. শকুন্তলা হালদার মানে ওই মেয়েটি, ছেলেটিকে ভেংচি কেটে একটা গাছে উঠে পড়লো।

: বলো কী হে? এরকমটা—

: হ্যাঁ আমিও ভাবিনি, যদিও ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু ওরা যে শেষে বাঁদর হয়ে যাবে—

: বাঁদর !! ?

: বাঁদর, কৃত্তিবাস দীর্ঘশ্বাস মোচন করলো, অথচ মনোকিনির কথা ভেবে আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

বাঁদর, মনোকিনি, কিচ্ছু বুঝছি না আমি, কৃত্তিবাস।

আরে মূর্খ, মনোকিনির যুগ কী বলছে না যে এর পরের যুগে মানুষ তার জন্মদিনের পোষাকে ঘুরে বেড়াবে!

না হয় মানলাম তাই, কিন্তু তাতে কী?

কী নয়, লোকে আস্তে আস্তে বলবে, "দাও ফিরে সে অরণ্য"। আর বলবেই বা কেন, এখনি বলছে। "বিবিধ ভারতী" শোন না? ইভলিউশ্যনের চাকা উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছে। এবং এই ঘোরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে তা তো শুনলেই। মানুষের যে ল্যাজ খসে গিয়েছিল, তা আবার গজাবে।

কিন্তু কৃত্তিবাস, ওরা যদি দুজনেই বাঁদর হয় তবে মেয়েটা পালালো কেন?

সাধারণ ব্যাপার বুঝতে তোমার যে কেন এত কষ্ট হয়, কৃত্তিবাস রুষ্ট হলো। আগে থেকেই তো জানতে যে ছেলেটির ফিলসফি আর মেয়েটির টেলিক্যাম্। বাঁদর হলেও দুজনে আলাদা জাতের তো।

মনে হল, রামধনু রঙের চোঙের ভেতর দিয়ে আমি হুহু করে এগিয়ে চলেছি···
নিবু-নিবু হলুদ সূর্যটা মাথার ঠিক ওপরে!

বেড়িয়ে এলেন গোকুলবাবু

অঞ্জনপ্রকাশ সেনগুপ্ত

স্কুলে থাকতে গোকুলবাবুর কাছে পড়েছি। ফাইন্যাল ইয়ারে তিনি ছিলেন আমাদের ক্লাশ টীচার। তার ভাইপো ছিল আমার সহপাঠী। কাজেই অমিত যখন বলল:

"আমার জ্যাঠামশায়ের মাথা বেশ খারাপ হয়ে গেছে, একদিন দেখবি দেখবি চল" তখন কথাটা মোটেই বিশ্বাস করতে পারিনি। অমিত আরও বলল, "যদিও স্কুল কোন রকমে তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন তাও আর হবে না। রাঁচী পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।" আমি বললাম, "পুরোপুরি খুলেই বল, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।"

"আর কি বলব বল। আমরা যেবার রাখীপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন থেকেই এর শুরু। ওখানে থাকতে রোজই আমরা বিকেলের দিকে ঘুরতে বের হতাম এক জ্যাঠামশায় বাদে। একদিন রাত্রি ৮টায় ফিরে এসে দেখি জ্যাঠামশায় বাড়ীতে নেই। সেদিন সারা রাতেও তিনি ফিরলেন না। এর ফলে সেই রাতে আমাদের যে কি হয়রানি হয়েছে সেটা আর নাই বললাম। এমনকি পুপু

পর্যন্ত সারারাত জেগেছিল। শেষে ভোর বেলায় তাকে আমাদের বাড়ী থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা শুকনো নালার ভিতর পাওয়া গেল। শরীরের কয়েক জায়গায় তার-টার প্যাঁচান। মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না এর। আর মুখ চোখ বেশ ফোলা ফোলা। ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসা হল আর অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। তিনি যে সব কথা বলতে শুরু করলেন তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে। তারপর এখন মাঝে মাঝে তিনি কি বিড় বিড় করেন ক্লাশে, কমনরুমে, বাথরুমে রাস্তায় যেখানে সেখানে। আর তুই তো জানিস ডিটেকটিভ বই পড়তে জ্যাঠামশায় কি ভালবাসেন। পঞ্জিকায় যে সব ডিটেকটিভ বইএর বিজ্ঞাপন থাকে সেগুলো কিনে কিনে তিনি আমার তাক পর্যন্ত বোঝাই করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ওগুলোর দিকে তিনি এখন একবার তাকান না। দিন দিন ধূলো জমে যাচ্ছে। চল না গেলেই বুঝতে পারবি।" আমি অমিতকে একদিন যাওয়ার কথা দিলাম।

একদিন রবিবার খাওয়া দাওয়া সেরে অমিতদের বাড়ি চলে এলাম। গিয়ে দেখি গোকুলবাবু একা বাড়ীতে। সব নাকি কোথায় গিয়েছে। মনে মনে ভাবলাম অমিতকে আগে থেকেই জানিয়ে এলে ভাল হত। এদিকে গোকুলবাবু আমায় দেখে অবাক। "কি হে এতদিন পর। বস বস।" আমি গোকুলবাবুর কথাবার্তায় বা চাউনিতে অস্বাভাবিক কিছুই দেখলাম না। সেই আগের মতই শান্ত ও ধীর স্থির। তবুও আমি না বলে পারলাম না, "স্যার, অমিতের মুখে আপনার অসুস্থতার খবর পেয়ে আপনাকে দেখতে এলাম।"

বলা মাত্রই উনি ধড়ফড় করে উঠলেন, "এ্যাঁ! কি বললে?" তারপরেই এক হতাশার নিঃশ্বাস, "আশ্চর্য, ওরা এতদূরেও রটাচ্ছে এইসব বাজে কথা।"

আমি বললাম, "অমিত যে বললো···

"কি বললো? বল।" আমি বলতে গিয়ে ঢোঁক গিললাম। তিনি নিজেই বললেন, "বুঝেছি। আমাকে সেই ড্রেন থেকে পাওয়ার কথা?" অতি কষ্টে জবাব দিলাম, হ্যাঁ।বলেই ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলাম। তিনি বললেন, "তুমি নিজে একবার ভেবে দেখনি কেউ কি শুধু শুধু ওরকম কাণ্ড করে বসে কখনও?"

আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, কি হয়েছিল আপনার?" তিনি উদাস ভাবে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সে কথা বলতে গেলে মাঝপথে তুমিও তো আমাকে···মানে··· ইয়ে··" আসলে সে কথা বলতে তিনি মোটেই রাজী নন। আমি অনেক কষ্টে অনেক অভয় দিয়ে তাকে রাজী করালাম। তিনি বল্লেন,

"তুমি জানো গত বছর আমরা পুজোয় রাখীপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আমরা সংখ্যায় ছিলাম নয়জন। একটা ছোট্ট মতন দোতলা বাড়ী ভাড়া নিতে হয়েছিল যদিও সেটা ষ্টেশন থেকে অনেক দূর। পাঁচ মাইল তো হবেই। ওখানে বসতি ছিল অল্প। যা ছিল বেশীর ভাগই বাঙালী। ছুটিতে সব কলকাতা চলে এসেছে। কাজেই জায়গাটাকে যদি জনহীন বল খুব ভুল হবে না। বাড়ীর সবাই যখন বেড়াতে যেত আমি থাকতাম পাহারায়। অতো হুড়োহুড়ি আমার পোষায় না জানই তো। আমি নতুন সাতখানা সর্বে ফুল সিরিজের বই নিয়ে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার দিকে সেগুলো নিয়ে বসতাম। আর সারাটা বিকেল কাটত বাড়ি থেকে আধ মাইলেরও কম দূরে একটা টিলার উপর। ওখান থেকে যে সুন্দর দৃশ্য দেখা যেত তাতে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আর অবাক লাগত অতি নিকটবর্তী একখানা সবুজ রঙের বাড়ি দেখে। তিনতলা। সুন্দর সাজান গোছান। আর চিলকোঠা ভেদ করে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত একটা চোঙ্।

অত সুন্দর বাড়ীতে একটা ময়লা চোঙ্‌ ফিট করে কেন শো নষ্ট করা হয়েছে বুঝতাম না।

তুদিন যাওয়ার পর তিনদিনের দিন সবুজ বাড়িটাকে আমার চোখে একটু যেন কি রকম কি রকম বলে ঠেকল। আমি যখনই বাড়িটাকে দেখছি সব সময়ই সদর গেট খোলা। কিন্তু কোন লোককে একদিনও বাড়ির ভেতর দূরের কথা আশে পাশে কোথাও দেখিনি। তাই আমি ধরে নিয়েছিলাম বাড়িতে আপাতত কোন লোক নেই। বিলকুল ফাঁকা। কিন্তু তাই যদি হবে তবে দরজা জানলা খোলা কেন? যাই হোক কি ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না। আমার কিন্তু জানবার ইচ্ছে ছিল রাত্রে বাড়িতে আলো জ্বলে কিনা। কিন্তু তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সারাটা বিকাল টিলার উপর বসে থাকলেও যখনই দেখতাম দূরের পাহার পাহাড়ের সারি আবছা হয়ে আসছে তখনই ওখান থেকে নেমে আসতাম। এ ভাবেই বেশ কাটছিল।

সপ্তম দিনের দিন ওই বাড়িটার উপর আমার বিস্ময় চরমে উঠল। আমি একটা পাথরখণ্ডের উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে সবুজ বাড়িটার দিকে মুখ করে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম সেই চোঙ্‌ নিঃশব্দে কাতারে কাতারে কালো ধোঁয়া কুণ্ডুলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে।"

"ধোঁয়া।" আমিও অবাক হলাম।

"হ্যাঁ, ধোঁয়া। আমিও অবাক হলাম। হ্যাঁ, ধোঁয়া। কুচকুচে কালো। ক্রমশই বাড়তে লাগল। তারপর সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল। যেন বিরাট বড় একটা ফ্যাক্টরী। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। তখনো সূর্য ডুবতে কিছুটা দেরী আছে। লক্ষ্য করলাম পূবের আকাশ দারুণ কালো হয়ে এসেছে। একটু পরেই ঝড় শুরু হবে। ভাবলাম উঠবো কিনা। ওমা, সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল

ঠাণ্ডা হাওয়া। ক্রমশঃ হাওয়ার বেগ বাড়তে লাগল। শুরু হল ঝড়। ঝড়ের সে কি আওয়াজ। আমি ওঠবার আগে পলকের জন্যে সবুজ বাড়িটার দিকে তাকালাম। দেখলাম বৃষ্টির ভয়ে সব জানালাগুলো ধপাস্ ধপাস্ করে বন্ধ হচ্ছে। এক কিনারের একটা জানলা বন্ধ করার জন্যে যে হাত মুহূর্তের জন্যে বেরিয়েই আবার কপাটটাকে টেনে নিল সে হাত দেখে আমি পাথরের মত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ঝড় বৃষ্টির গর্জন আমাকে বিচলিত করল না।''

"কি রকম হাত আপনি দেখলেন?" আমি থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম।

''বলছি। কনুই পর্যন্ত হাতটি একটি কালো রবারের গ্লাবস দিয়ে ঢাকা। যাই হোক আমি বেশ বোকা বনে গেলাম। ধারণা ছিল বাড়িতে একটা লোকও নেই। কিন্তু এ যে মনে হচ্ছে একটা কারখানা। এদিকে কোনও লোকজনও তো দেখি না। ব্যাপারটা কি? গোপন কিছু নাকি? ভাবতেই শরীরটা কেঁপে উঠল। ততক্ষণে প্রবল বেগে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে বাড়ি চলে এলাম। তখন একেবারে স্নান সেরে ফেলেছি।

এরপর তিনদিন বাড়ির বাইরে পা দিতে পারিনি। এক নাগাড়ে যা বৃষ্টি শুরু হয়েছিল তা আর থামবার নাম নেই। সকলেরই মন খারাপ। হৈ হুল্লোড় বন্ধ হয়ে গেছে। আমারও খুব খারাপ লাগছিল। কেন না মনে মনে প্ল্যান রেখেছি বাড়িটার রহস্য যে করেই হোক বের করব। কয়েকদিন পর রোদ উঠল। একটানা পচা বৃষ্টির পর চারদিক যেন ঝলমলিয়ে উঠল। আমি ঠিক করলাম এখনই সটান বাড়িটায় গিয়ে কোন লাভ হবে না। আরও কয়েকদিন টিলার ওপর থেকে ওয়াচ্ করি। হয়ত আরও কিছু দেখতে পাব। সেদিন বিকেল না হতেই বেশ খুশিমনেই আমি চললাম আমার গন্তব্যস্থলে। পৌঁছিয়েই দেখি ওখানে আর এক ব্যক্তির আগমন হয়েছে। এই প্রথম আমি টিলাটার উপর মানুষ দেখলাম।

লোকটির পরণে একটা বহু পুরানো ঢোলা প্যান্ট। পায়ে ময়লা হকি খেলার জুতো। গায়ে একটা মোটা কোট খাকি প্যান্টটার সাথে ম্যাচ করান। গায়ের রং কালো হলেও খুব বেশী নয়। বয়স হয়ত ৪৫ আঙ্গুলের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট শেষ হয়ে এসেছে তবু ফেলবার নাম নেই।

আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, "নমস্কার; এখানকার আবহাওয়ার উপর রেগে গেছেন নিশ্চয়ই ?"

কিছু ভাববার আগেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আপনাকে তো আমি চিনতে পারলাম না।'

ভদ্রলোক অমায়িক হেসে জবাব দিলেন, 'ও হো, তা তো ঠিকই। আপনি আমাকে আর কি ভাবে চিনবেন ? আপনি ওই বাড়িতে উঠেছেন না ?'

বললাম, হ্যাঁ।

"আপনি যখনই এখানে এসে হাওয়া খান আমি ঘরে বসে বসে আপনাকে দেখতে পাই ভাবলাম একদিন গিয়ে আলাপ করে আসব। কিন্তু নানা ঝামেলায় বের হওয়া মুস্কিল। কতদিন থাকছেন ?'

'এই তো মাসখানেকের ছুটি। দশদিন কেটে গেল। আপনার বাড়ি কোথায় ?'

'এই যে সামনেই'—বলেই ভদ্রলোক সবুজ বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল আমার পেটটা বেশ ফাঁপা আর শরীরের ভেতর গোড়ালি থেকে ব্রেন পর্যন্ত কি রকম ঝিন্ ঝিন্ করে উঠলো। খালি বললাম, 'ও! আচ্ছা।' ভদ্রলোক গায়ের কোটটা খুলে ফেললেন। দেখলাম একটা গেঞ্জি বাদে আর কিছুই তার পরণে নেই। কি সর্বনাশ, মারপিট করবে নাকি ? না তা নয়। তিনি কোটটা দিয়ে ধুলোবালি ঝাড় দিতে দিতে বললেন, 'এই নোংরা জায়গায় প্যান্ট পরে বসলে প্যান্টের আর 'প্যা'ও থাকে না।' শেষে চারদিকে ধূলোর ঝড় তুলে তিনি যখন হাসতে হাসতে কোটটা গায়ে

চেপে বসে পড়লেন তখন ভাবলাম ছিট টিট নেই তো মাথায় ? কিন্তু এরপর তার পাশে বসে প্রায় একঘণ্টা ধরে গল্প করতে করতে অবাক হয়ে গেলাম। এত সরলও হয় মানুষ। ভদ্রলোকের নাম নলিনাক্ষ রায়। তিনি হঠাৎ আমায় পরদিন বিকেলে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে বসলেন। আমিও দেখলাম বাড়িটার রহস্য বের করার এই সুযোগ। কেননা আমি যতই তার বাড়ির কথা তুলেছি ততই তিনি সুকৌশলে সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। কাজেই আমি তাঁর নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলাম। পরে রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবে দেখেছি তিনি বিনা কারণে তাঁর বাড়ির কথা সব সময় এড়িয়ে যাননি। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কিন্তু আমাকে তাহলে তিনি আলাপ টালাপ না জমতেই নিমন্ত্রণ করে বসলেন কেন ? যাই হোক কালই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে এই ভেবে ঘুম দিলাম। পরদিন ঠিক সময় রওনা দিলাম সেই ভদ্রলোকের বাড়ির দিকে। গেট খোলাই ছিল। সোজা ঢুকে পড়লাম। একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল-এ হাত দিতে না দিতেই কোথা থেকে নলিনাক্ষবাবু স্বয়ং আমার সামনে উপস্থিত। দেখেই মনে হল এতক্ষণ তিনি আমার জন্যে কোথাও ঘাপটি মেরে ছিলেন। এক গাল হেসে আমাকে ঘরে নিয়ে বসালেন। ঘরের ভিতর বেশ আগোছাল আর নোংরা। বুঝলাম এসব দিকে তাঁর কোন নজর নেই। যাই হোক চেয়ারে বসে পড়লাম। সামনের চেয়ারে একটা ইংরেজী বই পড়ে ছিল। বই-এর নামটা দেখলাম 'Problems and Some notes on Fourth Dimension' By H. H······বাকিটুকু পড়ার আগেই তিনি ওটাকে সরিয়ে ওখানে বসে পড়লেন। বললেন, 'কি যে আনন্দ হচ্ছে কি বলবো।' এধরনের কমন কথা আমার মোটেই ভাল লাগে না। এরপর তিনি বকবক শুরু করলেন। পরিবেশটা আমার বেখাপ্পা লাগছিল।

'নিশ্চই, নিশ্চই,' 'তা আর বলার' 'হুঁ' এসব বাদে কোন কথাই বলছিলাম না। তারপর চা খাওয়া শুরু হল। খানিকক্ষণ পর যে

চাকরটা কাপ প্লেট নিতে এল সে আমার অগোচরে নলিনাক্ষবাবুকে ইশারায় কি যেন বোঝানোর চেষ্টা করল, তা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টি এড়াতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে নলিনাক্ষবাবুও আমার সামনে অতি সাধারণ ভাবে বসে থাকার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তিনি কেন জানি বেশ সজাগ ও চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আমিও ছাড়বার পাত্র নেই। নাক কান ও চোখকে যথাসম্ভব সতর্কতার সাথে কাজে লাগালাম। অমনি কানে এল একটা বুপ্ বুপ্ আওয়াজ খুব আস্তে। কোনদিক থেকে আসছে কিছুই বোঝা গেল না। হঠাৎ নলিনাক্ষ বাবু উঠে দাঁড়িয়ে একটা কাগজ আমার সামনে রেখে বললেন, 'আপনি কাগজটা দেখুন আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি।' বুপ্ বুপ্ আওয়াজ ততক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গেছে। নলিনাক্ষবাবু তড়িৎ গতিতে উধাও হলেন। আমি বাইরে কোন সংশয় প্রকাশ না করে কাগজটার দিকে মন দিলাম। তখনই অবাক কাণ্ড। দেখলাম তিনি আমাকে প্রায় পনেরো দিন আগের একটা স্টেটসম্যান দিয়ে গেছেন। এটা ইয়ারকি না খুব বেশী অন্য-মনস্কতার ফল বোঝা গেল না। হঠাৎ কাগজ থেকে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাতেই শরীর একটা ভয়ের শিহরণ খেলে গেল। বাইরে যাবার যে দরজাটা এতক্ষণ হাঁ করে খোলা ছিল সেটা বন্ধ করল কে? কি রকম একটা সন্দেহ হল। এক লাফ মেরে দরজার কাছে গিয়ে জোরে টান দিলাম। দরজা খুলল না।

টলতে টলতে নিজের জায়গায় গিয়ে কোন রকমে বসলাম। একজন ঢ্যাঙা মতন লোক ডান দিকের খোলা দরজাটা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল। বলল, 'মিঃ রায় আপনাকে ডাকছেন। আমার সাথে আসুন।' বলেই সেই দরজাটা দিয়ে বের হবার উদ্যোগ করল। আমি চেয়ার থেকে উঠলাম না। নলিনাক্ষবাবু এঘর থেকে পালালেনই বা কেন আর দরজাই বা বাইরে থেকে বন্ধ করল কে? এইসব ভাবতে ভাবতে আমি বোধহয় আর প্রকৃতিস্থ থাকতে পারলাম না। চোখের

দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। দেখতে পেলাম একটা চিমনি দিয়ে অনর্গল কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে আর ধোঁয়ার চেয়েও বেশী কালো একটা হাত আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চোখ রগড়ে দেখলাম কোন হাত নয় সেই ঢ্যাঙা লোকটাই একপা একপা করে আমার সামনে এসে উপস্থিত। বুপ্ বুপ্ আওয়াজ ততক্ষণে প্রায় দশগুণ বেড়ে গেছে। আর সেই আওয়াজ ভেদ করে আমার কানে ঢুকলো কয়েকটি কথা, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত গোকুলবাবু, আপনি নিজে না এলে আমাকে বলপ্রয়োগ করতে বলা হয়েছে।' এই কথা শোনা মাত্র আমার গা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যেতে হবে?' ঢ্যাঙা লোকটি হেসে বলল, 'আসুন আমার সাথে।' তারপরেই একদম কানের কাছে মুখ এনে বললে, "আপনি যা ভাবছেন মোটেই তা নয়। আপনার ওপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার বা অন্য খারাপ কিছু করার অভিপ্রায় মিঃ রায়ের নেই। ওনার একটা কাজে সাহায্য করার জন্যে আপনাকে ডাকা হয়েছে। এর আগে অনেককে মিঃ রায় অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু সবাই রাজি হওয়া তো দূরের কথা তারা রায়কে ছিটগ্রস্ত ভেবে তাঁর সাথে কথাই বন্ধ করে দিয়েছেন। শেষে নিরুপায় হয়ে আপনাকে উনি কায়দায় ক্যাপচার করলেন।' একদমে কথাগুলো বলে লোকটা যখন থামল তখন ভাবলাম কিছু জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ লোকটা একটা লিফটের সামনে নিয়ে এসে জোর করে ভেতরে ঠেলে দিল। লিফট্ উঠতে শুরু করল। রাগে ভয়ে ছটফট করতে লাগলাম। যত রাগ পড়ল নলিনাক্ষবাবুর উপর। বলা নেই, কওয়া নেই, একি অভদ্রতা! ঠিক করলাম এবার সরাসরি নলিনাক্ষবাবুকে তার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করব। ভালো মানুষ সাজার আর দরকার নেই।

লিফট্ থামল একটা বারান্দার সামনে। তিনটে লোক আমাকে জাপটে ধরে একটা ঘরে নিয়ে ঢুকলো। তারপর জোর করে একটা

খাটে শুইয়ে দেওয়া মাত্রই ঘরটা হঠাৎ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। এমন সময় কানে এল নলিনাক্ষবাবুর গলা। কোথা থেকে বলছেন অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না। তিনি বললেন,

'গোকুলবাবু, আমি জানি আপনি দারুণ ভীতু। কিন্তু সাবধান, বাচ্চাকাচ্চার মতন কান্নাকাটি বা চেঁচামেচি করবেন না। আপনাকে আমি একখানে পাঠাব। কিন্তু মাঝপথে যদি ভয়ে হার্টফেল করেন তো কেলেঙ্কারি বাধবে। অবশ্য এতে আপনারই লাভ। বেশ কয়েক বছর পর আপনি কি অবস্থায় কোথায় আছেন সেটা একটু পরখ করে আসবেন মাত্র। পৃথিবীতে কজন এই সুযোগ পেয়েছে? অতএব ভয় হঠান।' একটু থেমে আবার বললেন, 'ব্যাপারটা কি বোধহয় মাথায় ঢুকছে না? শুনুন তাহলে মোদ্দা কথা হচ্ছে ভ্রমণ। স্রেফ্ ভ্রমণ। একটু নতুন জায়গায়। আপনার এ হবি নেই? না থাকলেও যদি কেউ বিনা পয়সায় আপনাকে আজ দিল্লী, কাল বম্বে, পরশু লাস ভেগাসে সারারাত, তরশু রায়ো ডি···' বলার মাঝপথে আমি একটা বিকট চিৎকার করে উঠলাম। চিৎকার শুনে নলিনাক্ষবাবু বোধ হয় থতমত খেয়ে গেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। তারপর আবার তাঁর গলা শোনা গেল, 'আপনার সাথে দেখছি গিনি-পিগ্ বা খরগোশের কোন তফাৎ নেই। এর আগে ওদের নিয়ে যখন এক্সপেরিমেণ্ট করেছি তখন আমি কোন কথা বললেই ওগুলো ঠিক এভাবে চেঁচিয়ে উঠত। কিন্তু আপনি আমার মতন মানুষ বলেই কিছু শোনাতে চাইছিলাম আপনাকে। যাক্ যদি শুনতেই না চান তো বয়ে গেল।' তিনি থামলেন। ঘরে একটা খুব অল্প পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলে উঠলো। দেখলাম কতকগুলো অচেনা লোক আমাকে ঘিরে নানা কাজ শুরু করে দিল। দুজন আমাকে চ্যাংদোলা করে শূন্যে তুলে আবার শুইয়ে দিল। অনুভব করলাম আমি আর বিছানার উপর শুয়ে নেই একটা ঠাণ্ডা অথচ খুব শক্ত কিছুর উপর শুয়ে আছি। তারপর আমার শরীরের কয়েক জায়গায় তার-টার প্যাঁচিয়ে লোকগুলো

উধাও হল। ঘরটা সেই আগের মত অন্ধকার হল। আবার নলিনাক্ষ বাবুর গলা ভেসে এল,

'গোকুলবাবু, রেডী! সময় হয়ে এল। তবু ইলেভেনত্ আওয়ারে কয়েকটা কথা না বললেই নয়। আপনি জলপথ, স্থলপথ ও আকাশ পথে খুব ঘুরেছেন মনে হয়। আজ বেড়াতে যাবেন একটু অন্য জায়গায়। তবে ওই একটি পথেও নয়। যেতে হবে সময় পথে। আর আপনার ডেসটিনেশন হচ্ছে ১৯৭৭-এর পয়লা ডিসেম্বর। ঠিক সাত থেকে দশ মিনিটের জন্যে ওই দিন আপনি কেমন অবস্থায় থাকবেন সেটা একটু প্রত্যক্ষ করে আসুন। এর চেয়ে ভাল গণৎকার পাবেন কি?' এরপর তিনি টা টা বলে বিদায় জানিয়ে চুপ করলেন।

আমার সামনে নিকষ কালো অন্ধকার। মনে হচ্ছে আলকাতরার সমুদ্রে ডুব দিয়েছি। আর অসহ্য নিস্তব্ধতা। কোথাও কোন রকম শব্দ নেই। হঠাৎ দেখলাম আমার চারপাশে বিচিত্র রঙের সমারোহ। মনে হল রামধনু-রঙের ভেতর দিয়ে আমি হু হু করে এগিয়ে চলেছি আর সারা শরীরে অসম্ভব রকমের জ্বালা শুরু হল। সে যন্ত্রণা সইতে না পেরে আমি চোখ বুজলাম। কতক্ষণ চোখ বুজে ওই যন্ত্রণা সহ্য করেছিলাম জানি না। যখন চোখ খুললাম তখন...... যা দেখলাম বললে বিশ্বাস করবে? আমাকে তুমিও ইয়ে বলবে না তো? কথা দাও বলবে না।"

আমি গোকুলবাবুকে যথাসম্ভব অভয় দিলাম।

তিনি বলতে লাগলেন, "চোখ খুলেই দেখলাম আমার সামনে পেছনে ডানে, বাঁয়ে ধু ধু বালুরাশি। যে দিকেই তাকাই বালু আর বালু। মাঝে মাঝে কোথাও দু চারটা U আকারের গাছ না অন্য কিছু বুঝলাম না আর হাত দশেক দূরেই দেখলাম একটা প্রকাণ্ড বড় রকেট। সিনেমায় দু চারটে রকেট যা দেখেছি তা থেকেই অবশ্য এ আন্দাজ করলাম। আর ওই রকেটের সামনে বেশ কয়েকটি

লোক। জন দশেক তো হবেই। ওদের মধ্যে একজন আমার দিকে এগিয়ে এল। পরনে নতুন ধরনের ইউনিফর্ম বলেই মনে হল। লোকটি ইংরেজিতে আমায় বলল, 'যা বললাম মনে রাখবেন। দুমাস পর পর সিগন্যাল পেলেই আপনারা যে যেখানে থাকুন ঠিক এ জায়গায় চলে আসবেন। আমরা তখন আবার আপনাদের পিল খাইয়ে চলে যাব। আরও যদি কিছু জানবার থাকে পুরণো যারা এখানে আছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবেন।' বলেই লোকটা এক পা এক পা করে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

আমি দেখলাম এখানে আকাশের রঙ কি রকম ফ্যাকাশে নীল। দিনের আলোও মানানসই নয়, ঘোলাটে আর ম্লান। নিবু নিবু হলুদ সূর্যটা মাথার ঠিক উপরে। অনেকক্ষণ পর বেশ শীত শীত লাগতে শুরু করল, আর ঠিক তক্ষুণি সেই রকেটের সামনেকার ছোট ভিড়টা থেকে একটা ডাক কানে এল! আমাকেই ডাকা হচ্ছে। সকলের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেই লোকটা সবাইকে বিদায় জানিয়ে রকেটের দিকে পা বাড়াল। আমি আমার চারপাশের লোকদের দিকে তাকালাম। প্রত্যেকের চোখে জল। দু জন জাপানী বুড়োকে দেখলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে! একে একে সকলকেই দেখতে লাগলাম। দেখলাম গোটা চারেক নিগ্রো, দুটো গুণ্ডা টাইপের অ্যামেরিকান, তিনজনকে কোন দেশীয় বুঝলাম না। ভারতীয় বলতে আমি ছাড়া এক গুজরাটি ভদ্রলোককে দেখলাম। সকলের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে।

সেই গুজরাটের ভদ্রলোক আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বাঙালী'? আমি হ্যাঁ বলা মাত্রই উনি হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করলেন,

'জানেন, আমি বলতে গেলে কিছুই অপরাধ করিনি আর আমাকেই বদমাসগুলো শাস্তি খাওয়ালো। আর ওই চুণীলাল,

চুণীলালের বাপ দুজনেই একসাথে থাঁকে খুন করল—আমি হলাম দোষী। তা আপনাকে কেন পাঠাল?'

আপনি কি খারাপ কাজ করলেন?'

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম কোথা থেকে কি হল। মাথায় যে কিছুই ঢুকছেনা। লোকটার কথা শুনে আর চারপাশ দেখে তো মনে হচ্ছে এটা অন্য একটা গ্রহ আর পৃথিবীর অপরাধীদের এই গ্রহে শাস্তি দেওয়া হয়। তাহলে আমি আবার কবে কি করলাম? এ্যাঁ! ভাবনার মাঝে লোকটা আবার তাগাদা দেয়, কি বাবু আপনিও কি……' দূরে হল্লা শোনা গেল। সবাই চকিতে বিস্তীর্ণ বালুরাশির শেষ প্রান্ত অবধি চোখ মেলে দিলাম আর দেখলাম দূর থেকে ছুটে আসছে একদল লোকদল লোক। একসাথে অনেক। চেঁচামেচি হৈ হৈ করতে। সেই লোকটি এখন বলল, 'দেখছেন বাবু সব এখানকার পুরনো লোক। এদেরকে বোধ হয় গত বছর পাঠান হয়েছিল। চলুন ওদের সাথে কথা বলি। ওরা কি ভাবে এতদিন আছে জানতে হবে তো।' এর মধ্যে ছুটতে ওরা অনেক কাছে চলে এসেছে। চিৎকারে বোধহয় কানের তালাই ফাটিয়ে দেবে। মনে হল আমাদেরকে নতুন সঙ্গী হিসেবে পেয়ে আনন্দে উল্লাস করছে।

হঠাৎ কি জানি হল। শরীরে মোচড় অনুভব করলাম। আর সেই মুহূর্তে দেখলাম আমি আবার সেই আলোকিত চোঙের ভিতর। কোথায় গেল সেই ধূ ধূ বালু রাশি আর কান ফাটানো উল্লাস। শরীরে আবার সেই যন্ত্রণা। তখনই বোধ হয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

যখন চোখ মেলে তাকালাম তখন দেখলাম আমি একটা শুকনো নালার ভেতর চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। আর এক গাদা চেনা অচেনা মুখ আমার সামনে ভিড় করে আছে। এরপরের ঘটনা তো তুমি শুনেইছ।"

গোকুলবাবু যখন থামলেন দেখলাম তাঁর কপালভর্তি ঘাম, ঘনা ঘন নিঃশ্বাস পড়েছে। নিজে উঠে ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে আবার

এসে জাগায় বসলাম। তারপর বললাম, "আপনারা আর বাকি যে কটা দিন রাখীপুরে ছিলেন ততদিন নয় বাড়ির বাইরে আপনাকে কেউ বের হতে দেয়নি, কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে একবারও সেই বাড়ির একটু খোঁজ খবর নিলেন না। আমি হলে তো পুলিশ নিয়ে গিয়ে সেই বাড়িতে হানা দিতাম।"

"আমিও ভেবেছিলাম সে রকম কিছু একটা করব। কিন্তু এই চিঠিটা এর মাঝে একদিন আমার স্কুলের ঠিকানায় আমার কাছে এসেছে। প্রথম যেদিন তার সাথে আমার আলাপ হয়েছিল সেদিন আমি কথায় কথায় কোন স্কুলে কাজ করি এরকম সব অনেক কথা বলেছিলাম। তিনিও সেটা মনে রেখেছিলেন। যাই হোক চিঠিটাও আমি ভয়ে কাউকে দেখাই নি। তোমাকেই প্রথম দিচ্ছি।"

আমি হাত বাড়িয়ে খামটা নিয়ে ভেতরের কাগজ বের করলাম। দেখলাম পারমানেণ্ট ব্ল্যাক কালিতে লেখা একখানা সুদীর্ঘ চিঠি।

গ্লাসগো

১লা জানুয়ারী ১৯৬৬

গোকুল বাবু,

অবাক হবেন নিশ্চয়ই এই চিঠি পেয়ে এদিকে আমার এদিকে আমার উপর প্রচণ্ড রেগেছেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। যাক্ সে সব মামুলি কথা। আমার গবেষণায় আমি সফল হয়েছি কিনা সে বিষয়ে এখনও সেণ্ট পার্সেণ্ট সিওর হইনি। আমার প্ল্যান ছিল আপনার মুখে আপনার ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ শোনা। কিন্তু আপনি যখন ভবিষ্যৎ ভ্রমণ করে আমার টেবিলে ফিরে এলেন তখন দেখলাম আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তারপর অনেকক্ষণ ধরে আপনার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করেও সফল হলাম না। ততক্ষণে রাত হয়ে এসেছে। আপনাকে নিয়ে কি করি কি করি ভাবছি এমন সময় ঠিক করলাম আপনাকে বাড়িতেই যে করে হোক পৌঁছে দেই। ঠিক

তক্ষনি তিনজন লোককে ডেকে ওদের কাঁধে করে আপনাকে চালান করে দিলাম আপনারই বাড়ীতে। ওদেরকে বলে দিয়েছিলাম নিঃশব্দে বারান্দায় অন্ধকারে আপনাকে রেখে সঙ্গে সঙ্গেই কেটে পড়তে। লোকগুলো আমার বহুদিনের পুরনো বিশ্বস্ত কর্মচারী। কিন্তু এত গবেট জানতাম না। কেননা ফিরে এসে ওরা যা বলল তাতে তাজ্জব বনে গেলাম। ওদের হয়ে পরিমল আমায় বলল, "আমরা যখন টিলার পাশ কাটিয়ে পাকা রাস্তার উপর গিয়ে পড়লাম তখনই সামান্য দূরে লাইট পোষ্টের অল্প আলোতে দেখলাম অনেক লোক কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছে আবার তার মধ্যে বাচ্চা কাচ্চাদের কিচির মিচিরও শোনা যাচ্ছে। গণেশ হঠাৎ বলে উঠল— 'এই রে! এরা নির্ঘাত গোকুলবাবুর বাড়ির লোকজন। ঘুরে ফিরে বাড়ি ফিরছেন।' তক্ষুনি পড়ি কি মরি বলে আমরা রাস্তার পাশে একটা ড্রেনে নেমে পড়লুম। একটু পরেই খটাখট শব্দ করতে করতে ওই দলটা চলে গেল। বুঝলাম এখন গোকুলবাবুকে বাড়িতে নিয়ে গেলেই সবাই টের পেয়ে যাবে। তাই ওনাকে ওই নালাতেই শুইয়ে রেখে এসেছি। জ্ঞান ফিরলে আপনা আপনিই বাড়ি পৌঁছুতে পারবে।' ওদের কথা শুনে দারুন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই হল না দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি আপনারা রিক্সা বোঝাই হয়ে ষ্টেশনের দিকে চলছেন। বুঝলাম ল্যাটা চুকে গেল।

এদিকে আপনার ওই একটা ট্রিপ করে দেওয়ার ফলে আমার যা খরচ হয়েছে তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। দ্বিতীয় বারের জন্যে কাউকে পাঠানর খরচ আর কুলোচ্ছে না। আর যন্ত্রপাতির আরও কিছুটা সংশোধন দরকার। প্রচুর টাকা লাগবে। দেশে কোথাও সাহায্য পেলাম না। তাই এই সুদূর বিদেশে এক বন্ধুর সাহায্যের ভরসা পেয়ে চলে এলাম। ও এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছে। আমার ঠিকানা আপনাকে দিলাম না। দিয়ে

কিই বা হবে? আশা করি কয়েক মাস পরই আমার এই আবিষ্কার দেশে দেশে প্রচারিত হবে।

নববর্ষের অভিনন্দন সহ

নলিনাক্ষ রায়

পুঃ চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে আবার জ্ঞান হারাবেন না।

চিঠিটা শেষ করে গোকুলবাবুর হাতে দিলাম। সিলিং ফ্যানের আওয়াজ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। কি রকম থমথমে ভাব। গোলকবাবু আমায় চা খেতে বললেন। আমি খালি এক গ্লাস জল খেয়ে রাস্তায় নেমে পা চালালাম।

এর কয়েকদিন পর চুপি চুপি মাসীমা অর্থাৎ অমিতের জেঠিমাকে গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে গোকুলবাবু মোটেই পাগল হন নি। কিন্তু তিনি আমার কোন কথাই শুনবেন না। তাঁর মতে এই 'বুড়ো' বয়সে বগলভর্তি ইলেকট্রিক তার পেঁচিয়ে সারারাত একটা ড্রেনে শুয়ে থাকার নাকি কোন মানেই হয় না।

আমি কিন্তু প্রায়ই ভাবি মানুষ দিন দিন যতই উন্নতি করে করুক কিন্তু গোবেচারা গোকুলবাবুর সাথে ওই 'ইয়ে' গ্রহের কেন এমন সম্পর্ক হতে যাবে··· কি বলব?

'আন্দামান' গ্রহের ···?

আশ্চর্য!

প্রকাশের স্থান: অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স, ৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪। প্রকাশের সময়: মাসিক। মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী: অসীম বর্ধন, ভারতীয়, ৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলি ১৪। সম্পাদক: আকাশ সেন, ভারতীয়, ৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলি ১৪। আমি, অসীম বর্ধন, উপরোক্ত তথ্যগুলি নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাস মতো সত্যরূপে ঘোষণা করছি। ১-৩-১৯৬৭ স্বাঃ অসীম বর্ধন।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত একটি গল্প

প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য

সত্যজিৎ রায়

৭ই এপ্রিল।

অবিনাশবাবু আজ সকালে এসেছিলেন। আমাকে বৈঠকখানায় খবরের কাগজ হাতে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'ব্যাপার কি? শরীর খারাপ নাকি? সকাল বেলা এইভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না!'

আমি বললুম, 'এর আগে কখনো এইভাবে বসে থাকিনি তাই দেখেন নি।'

'কিন্তু কারণটা কি?'

একটা নতুন যন্ত্র নিয়ে প্রায় দেড় বছর একটানা কাজ ক'রে কাল সকালে সেটার কাজ শেষ হয়েছে। অর্থাৎ এক্সপেরিমেণ্ট সফল হয়েছে। তাই ঠিক করেছি সাত দিন বিশ্রাম নেবো।'

অবিনাশবাবু একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনাকে পই পই করে বলছি এবার রিটায়ার করুন। 'আরে মশাই, বিজ্ঞানেরও ত একটা শেষ আছে—নাকি মানুষ অনন্ত কাল ধরে একটার পর একটা নতুন গবেষণা চালিয়েই যাবে?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আমার ত তাই বিশ্বাস। মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নেই।'

মানুষের না থাকলেও, আপনার জিজ্ঞাসার অন্তত সাময়িক বিরতি আছে দেখে খুশী হলুম। চলুন, বেড়িয়ে আসি'

কাজের সময় অবিনাশবাবু এসে পড়লে রীতিমত ব্যাঘাত হয়। অযথা আজেবাজে প্রশ্ন করেন, টিট্‌কিরি দেন, আর আমার সূক্ষ্ম, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কাজগুলো পণ্ড করার নানা ছেলেমানুষী চেষ্টা করেন। এতে যে উনি কি আনন্দ পান তা জানি না। তবে ভদ্রলোক আমার পঁচিশ বছরের প্রতিবেশী, তাই সবই সহ্য করি।

আজ যখন হাত খালি, তখন কিন্তু অবিনাশবাবুর সঙ্গটা খারাপ নাও লাগতে পারে। হাজার হোক, রসিক লোক। আর আমাকে ঠাট্টা করলেও, আমার অমঙ্গল বাসনা করেন, এমন কখনই মনে হয়নি। তাই অবিনাশবাবুর প্রস্তাবে রাজি হয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

গিরিডিতে বেড়াবার কথা বললে উশ্রীর ধারটাই মনে হয়। কিন্তু অবিনাশবাবু দেখি চলেছেন উল্টো দিকে অর্থাৎ তাঁর বাড়ির দিকে। ব্যাপার কী? কী ব্যাপার ভদ্রলোকের?

কিছুদূর যাবার পরে অবিনাশবাবু নিজেই কারণটা বললেন—'আজ একটা খেলনা পেয়েছি। সেটা আপনাকে দেখাবো।'

'খেলনা?'

'চলুন না। দেখলে আপনারও লোভ লাগবে—কিন্তু আপনাকে দেবো না সেটি।'

মনে মনে বললাম—খেলনার বয়স আপনার হয়ত থাকতে পারে—কিন্তু আমার কি আর আছে?

অবিনাশবাবু তাঁর বাড়িতে পৌঁছে সোজা নিয়ে গেলেন তাঁর বৈঠকখানায়। সেখানে একটা কাঁচের আলমারির সামনে নিয়ে গিয়ে তার দরজাটা খুলে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'দেখুন।'

আলমারির উপরের তাকে দেখি অনেক রকম গ্রাম্য খেলনা সাজানো রয়েছে—কেষ্টনগরের মাটির পুতুল, পোড়া মাটি ও চীনা মাটির জন্তু জানোয়ার, শোলার গাছ ও পাখি, কাশীর বাঘ ও আরো কত কী। আর এ সবের মাঝখানে রয়েছে একটি মসৃণ বল। অবিনাশবাবুর আঙুল সেই বলের দিকেই পয়েন্ট করছে।

'কেমন লাগছে আমার বলটা ?'

বলের মতই মসৃণ গোল জিনিসটা—তবে সেটা যে কিসের তৈরি তা বোঝা মুশকিল আর তার রংটার বর্ণনা করা বেশ কঠিন। কিছুটা মেটে, কিছুটা সবুজ, কিছুটা আবার হল্‌দে আর লাল মেশানো। একটা পাঁচমিশালি রং বলা যেতে পারে। বেশ মজার লাগল দেখতে বলটাকে।

আমার ইন্টারেস্ট দেখে অবিনাশবাবু যেন বেশ খুশি খুশি ভাব হয়েছে বলে মনে হোল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কোথায় তৈরি ? কোত্থেকে পেলেন ?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'প্রথমটির উত্তর জানা নেই। দ্বিতীয়টি খুব সহজ। কাল উশ্রীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি বালির ওপর একটা জলঢোঁড়া সাপ মরে পড়ে আছে। সাপটাকে দেখছিলুম, হাতখানেক দূরেই যে বলটা পড়ে আছে সেটা প্রথম লক্ষ্য করিনি। যখন করলুম, তখন এত ভালো লাগলো যে তুলে নিয়ে এলুম। একবার হাতে নিয়ে দেখবেন ? ওজন আছে বেশ।'

অবিনাশবাবু খুব সাবধানে তাক থেকে বলটা নামিয়ে আমার হাতে দিলেন। সত্যিই বেশ ভারী আর রীতিমত ঠাণ্ডা। সাইজে একটা টেনিস বলের দ্বিগুণ। কিন্তু হাতে নিয়েও বুঝতে পারলাম না সেটা কিসের তৈরি। মাটির ভাগ হয়ত কিছুটা আছে—কিন্তু তার সঙ্গে বোধ হয় আরো কিছু মেশানো আছে।

কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে বলটা ফেরৎ দিয়ে বললুম, 'বেশ ইন্টারেস্টিং জিনিস।'

অবিনাশবাবু আলমারির ভেতর বলটা রাখতে রাখতে বললেন, 'হুঁ হুঁ! তাহলে স্বীকার করুন যে আপনি ছাড়া অন্য লোকের কাছেও আশ্চর্য জিনিস থাকতে পারে!···যাক্‌গে, এবার চলুন সত্যিই একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। বেশ মেঘলা মেঘলা দিনটা করেছে।'

ঘণ্টা দু এক পরে বাড়ীতে ফিরে এসে আরেক বার আমার নতুন

যন্ত্রটাকে দেখে এলাম। এ যন্ত্র সম্বন্ধে বাইরে জানাজানি হলে আবার নতুন করে যে সম্মান পাবো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি মাইক্রোসোনোগ্রাফ। প্রকৃতির সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শব্দ, যা মানুষের কানে আজ অবধি কখনো শোনা যায় নি, এমন কি যার অনেক শব্দের অস্তিত্বই মানুষে জানত না—সেই সব শব্দ এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার শোনা যায়।

কাল পিঁপড়ের ডাক শুনেছি এই যন্ত্রে। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। কতকটা ঝিঁঝির ডাকের মতই, তবে ওরকম একটানা একঘেঁয়ে নয়। অদ্ভুত বৈচিত্র্য, সুরের ওঠানামা, স্বরের তারতম্য—সব কিছুই আছে ওই পিঁপড়ের ডাকে। আমার তো মনে হয় এই যন্ত্রের সাহায্যে ভবিষ্যতে আমি পিঁপড়ের ভাষাও বুঝতে পারবো। আর শুধু পিঁপড়ে কেন? এতে প্রকৃতির এমন কোন সূক্ষ্ম শব্দ নেই যা শোনা যায় না। একটা নভ আছে, সেইটে ঘুরিয়ে এর ওয়েভ লেংথ পরিবর্তন করা যায়। এবং এই ঘোরানোর ফলেই বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত আওয়াজগুলি ধরা পড়তে থাকে।

আমি বাড়ি ফিরে এসে একটা বিশেষ ওয়েভলেংথে নভটা সেট করে, আমার বারান্দার টবের গোলাপ গাছের একটা ফুল ছিঁড়তেই অতি তীক্ষ্ণ বেহালার স্বরের মত একটা আর্তনাদ আমার যন্ত্রটায় ধরা পড়ে। ওটা যে ওই গাছেরই যন্ত্রণার শব্দ সেটা ভাবতেও অবাক লাগে।

অবিনাশবাবু আমাকে তাঁর বল দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন। আমার যন্ত্রটির বাহাদুরির দু-একটা নমুনা দেখলে না জানি তাঁর মনের অবস্থা কি হবে!

১২ই এপ্রিল।

আজ সকালে আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফটা দেখানোর জন্য অবিনাশবাবুর কাছে আমার চাকর প্রহ্লাদকে পাঠাবো ভাবছিলাম—এমন সময় দেখি ভদ্রলোক নিজেই এসে হাজির।

তার চোখ মুখের ভাব এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের রকম দেখে মনে হল তিনি বেশ উত্তেজিত। আমি তখন যন্ত্রটা আমার বাগানের ঘাসের ওয়েভলেংথের সঙ্গে মিলিয়ে আমার মালীর ঘাস কাটার সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের সমবেত চিৎকার শুনছি। অবিনাশবাবু আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকে হাতের লাঠিটা দড়াম করে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে টিনের চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়লেন। তারপর একটা বড় নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, 'আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট করছেন— আর এদিকে আমার বাড়িতে যে তাজ্জব কাণ্ড চলেছে।'

অবিনাশবাবুর তাচ্ছিল্যের সুরটা মোটেই ভালো লাগল না। গলার স্বরটা যথা সম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'কী কাণ্ড?'

'শুনবেন কী কাণ্ড? আমার সেই বল—মনে আছ?

'আছে।'

'কেবল ঘণ্টায় ঘণ্টায়, রং বদলাচ্ছে।'

'কী রকম?'

'এত ধীরে বদলাচ্ছে, যে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও চোখ ধরা পড়ে না। কিন্তু আপনি যদি এখন দেখে আবার দু ঘণ্টা বাদে গিয়ে দেখেন, তাহলে চেঞ্জটা পষ্ট বুঝতে পারবেন। আমি ত নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে কদিন থেকে এই করছি।'

'এখন কি রকম দেখলেন?'

'এখন ত সকাল। সকালের চেহারা সেদিনে সকালের চেহারার মতই। এখন যদি দেখেন ত সেদিনের মতই দেখবেন। কিন্তু ঘণ্টখানেক পরে গেলে দেখবেন একেবারে অন্যরকম। সবচেয়ে শুরু হয় সন্ধে থেকে। কি রকম একটা সাদা সাদা ছোপ পড়তে আশ্চর্য ব্যাপার থাকে। পরে মাঝ রাত্তিরে যদি দেখেন ত দেখবেন একেবারে ধপ্‌ধপে সাদা। যেন একটি জায়াণ্ট সাইজ ন্যাফথ্যালিনের বল!'

'ভারি আশ্চর্য ত।'

'ভাবছি খবরের কাগজে একটা খবর পাঠিয়ে দিই। তবু এই এই গোলক রহস্যের জোরে যদি কিছুটা খ্যাতি হয়। জীবনে ত কিছুই হোল না। চাই কি, যাতুঘরের জন্য গভর্ণমেণ্টকে বেচে যদি হুপয়সা করে নেওয়া যায়, তাই বা মন্দ কী?'

অবিনাশবাবুর কথা শুনে বুঝলাম তিনি আকাশকুসুম দেখছেন। মুখে বললাম, 'এসব করার আগে একবার জিনিসটা নিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখলে হত না? হয়ত দেখবেন চোখের ধাঁধা কিম্বা আপনার দেখার ভুল।'

অবিনাশবাবু এবার রীতিমত রেগে উঠলেন। তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে লাঠিটা বগলদাবা করে নিয়ে বললেন, 'ভুল ত ভুল। আপনি থাকুন আপনার হাতুড়ে কারবার নিয়ে। আমি দেখি আমার বলের দৌলত কতখানি।'

এর প্রত্যুত্তরে আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ভদ্রলোক হন্‌হনিয়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিকেলের দিকে অনুভব করলাম যে বলটা সম্পর্কে আমারও মনের কোণে কেমন যেন একটা কৌতূহল উঁকি দিচ্ছে।

আমার যন্ত্রটা তখন একটু গণ্ডগোল করছে—বোধহয় ভিতরে কোন কনট্যাক্টের গোলমাল হয়ে থাকবে। সেটাকে পরে শোধরাবো স্থির করে অবিনাশবাবুর বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

গিয়ে দেখি ভদ্রলোক তাঁর বৈঠকখানার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত মনোযোগসহকারে একটা চিঠি লিখছেন। আমায় বললেন—'দেখুন ত মশাই ভাষাটা কেমন হয়েছে। এটা আনন্দ-বাজারকে লিখেছি।—'সবিনয় নিবেন, আমি সম্প্রতি একটি আশ্চর্য গোলক সংগ্রহ করিয়াছি যাহার তুল্য বস্তু পৃথিবীতে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। গোলকটির একাধিক বিস্ময়কর গুণ আছে। যথা, ইহা কোন পদার্থের সংমিশ্রণে নির্মিত তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব (স্থানীয় বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বরবাবু মহাশয়ও

এ-ব্যাপারে আমার সহিত একমত।) গোলকটির দ্বিতীয় গুণ—ইহার বর্ণ আপনা হইতেই প্রহরে প্রহরে পরিবর্তিত হয়। তৃতীয়ত—কেমন হচ্ছে?'

'বেশ ত। তৃতীয় গুণটি কি?'

'ওইটেই এখন লিখছি। সেটা হল—মাঝে মাঝে বলটাকে ধরলে কেমন ভিজে ভিজে মনে হয়। এখন দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

অবিনাশবাবু চিঠি লেখা বন্ধ করে আমাকে তাঁর আলমারির কাছে নিয়ে গেলেন। এবারে দেখলাম ভদ্রলোককে চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলতে হল। খুলে বললেন, 'হাত দিয়ে দেখুন, ভিজে টের পাবেন। আর ওই দেখুন কেমন সাদার ছোপ করতে আরম্ভ হয়েছে!'

আমি ডান হাতটা বাড়িয়ে বলটা ছুঁতেই আমার শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। আসলে আর কিছুই না—ছুঁয়ে দেখলাম যে বলটা শুধু ভিজে নয়, একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা!

অবিনাশবাবু বললেন, 'সেদিনের চেয়ে তফাৎ দেখলেন ত? এবার বলি কি, কিছুক্ষণ আরো থেকে অন্তত আরো কিছুটা পরিবর্তন দেখে যান। আমি ভেতরে বলে দিচ্ছি—আপনার রাত্রের খাওয়াটা সারুন, কেমন?'

গোলকের রূপান্তর দেখে সত্যিই আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। তাই অবিনাশবাবু অনুরোধ না করলে আমি নিজেই হয়ত আরো কিছুক্ষণ থেকে যাওয়ার প্রস্তাব করতাম।

পাঁচঘণ্টা ধরে বলের রং পরিবর্তন স্টাডি করে এই কিছুক্ষণ হল বাড়ি ফিরেছি। অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছি তখন রাত সাড়ে এগারোটা। বলের চেহারা তখন সত্যিই একটা অতিকায় ন্যাফথালিনের গোলার মত। আমার ইচ্ছে ছিল বলটাকে

অন্তত একবার একদিনের জন্য আমার কাছে এনে সেটাকে নিয়ে একটু গবেষণা করি—কিন্তু অবিনাশবাবু নাছোড়বান্দা। আমার উপর টেক্কা দেওয়ার সুযোগ কি সহজে ছাড়েন তিনি! তাঁর বিশ্বাস—গিরিডিতে আমিও থাকি, তিনিও থাকেন; অথচ আমারই কেবল জগৎজোড়া নাম ডাক হবে, আর তিনি অখ্যাত থেকে যাবেন—এটা ভারি অন্যায়।

কাল একবার দুপুরের দিকে বলের চেহারাটা দেখে আসতে হবে।

১৩ই এপ্রিল।—

আজ অবিনাশবাবু একটি গামছায় মুড়ে বলটিকে নিজেই আমার কাছে দিয়ে গেছেন। আপাতত সেটা আমার ল্যাবরেটরিতে একটা টেবিলের উপর কাঁচের ছাউনির তলায় সযত্নে রাখা রয়েছে। সারাদিন ধরে প্রাণ ভরে এর রং পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

অবিশ্যি অবিনাশবাবু এলেন বেশ নাটকীয় ভাবেই। তিনি যখন গামছার পুঁটলি হাতে আমার বৈঠকখানায় ঢুকলেন, তখন তাঁর মধ্যে গতকালের উৎফুল্লতার লেশমাত্র ছিল না বরং যে ভাবটা ছিল সেটা তার বিপরীত। যেন তিনি একটা ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছেন এবং তার জন্য তাঁকে একটা বিশেষরকম মানসিক ক্লেশ ও অশান্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

আমি তখন সবে কফি খাওয়া শেষ করছি। অবিনাশবাবু ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর বলসমেত গামছাটি রেখে ধুতির খুঁটে কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'না মশাই, আমাদের এ সব জিনিস হ্যাণ্ড্ল করা পোষায় না। এ রইল আমার কাছে। কলকাতা থেকে সাংবাদিক এলে আপনার কাছেই পাঠিয়ে দেব।'

আমি বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, 'কি হল? একরাতের মধ্যে এমন কী হল যে এত সাধের বলের উপর একেবারে বিতৃষ্ণা এসে গেল?'

'আর বলবেন না মশাই! এ বল অতি সাংঘাতিক বল—একেবারে শয়তান বল। জানেন, আলমারিটার মাথার উপর একটা টিকটিকি ছিল—সকালে দেখি মরে আছে। শুধু তাই নয়—আলমারির ভেতর থেকে ডজন খানেক মরা আরশুলা বেরিয়েছে।'

আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, 'বিনি পয়সায় এমন একটা ইন্‌সেক্‌টিসাইড পেয়ে গেলেন, আর আপনি তাই নিয়ে আপশোষ করছেন?'

'আরে মশাই শুধু ইন্‌সেক্‌ট হলে ত কথাই ছিল না। আমার নিজেরও যে কেমন জানি গা গুলোনো ভাব হচ্ছে।'

'দিন রাত জেগে বলটার রং বদলানো লক্ষ্য করছিলেন না?'

'তা করেছি।'

'তার মানেই ঘুমের অভাব হয়েছে—তাই নয় কি?

'তা হয়েছে।'

'তবে? গা গুলোনোর কারণ ত পরিষ্কার।'

'কী জানি মশাই। হতে পারে। কিন্তু তাও বলছি—এ বল আপনার কাছেই থাক। কেমন জানি উৎসাহ চলে গেছে—বুঝছেন না?'

আমি মনে মনে যা বুঝলাম তা হল অবিনাশবাবু ত বিজ্ঞান মানেন না—তিনি যেটা মানেন সেটা হল কুসংস্কার বলটার কাছাকাছি কটা পোকামাকড় মরতে দেখেই তার ধারণা হয়েছে যে বলটার মধ্যে বুঝি কোন শয়তানি শক্তি লুকানো আছে।

এতে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। আমার দিক থেকে দেখলে ঘটনাটা লাভজনকও বটে। তাই আমি দ্বিরুক্তি না করে বলটা রেখেই দিলাম।

এখন রাত সাড়ে বারোটা। সকাল আটটা থেকে কাঁচের ঢাকনার বাইরে থেকে রং পরিবর্তন স্টাডি করছি। সকালে মেটে, সবুজ, লাল, আর হলদে রং-এর খেলা। দুপুরের দিকে লাল আর হলদেটা

কমে আসে, সবুজটা আর একটু গাঢ় হয়। বিকেলের দিকে সবুজটা ক্রমশ লাল আর কমলার দিকে যেতে থাকে। তারপর যত সন্ধ্যা হয়—সেটা হয়ে আসে টক্‌টকে লাল যেন বলটা একটা পাকা আপেল।

সন্ধ্যা সাতটা থেকেই লক্ষ্য করছি বলের সমস্ত রং চলে গিয়ে কেমন যেন একটা ছাই ছাই রুক্ষ ভাব নেয়। দশটা নাগাদ সেই ছাই রং-এর উপর সাদার ছোপ পড়তে থাকে।

এখন বলটা একেবারে ধপ্‌ধপে ঝক্‌ঝকে সাদা। তারপর তার উপর আমার দেড়শ পাওয়ার ইলেকৃট্রিক লাইট পড়ছে যেন তা থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কাঁচের ছাউনির ভেতরে একটা আবছা কুয়াশার মত কী যেন জমা হচ্ছে। বরফ থেকে বাষ্প বেরিয়ে যে রকম হয় কতকটা সেই রকম।

কালকের দিনটাও এর পরিবর্তন স্টাডি করে, পরশু বলটাকে আমার টেবিলের উপর ফেলে এর একটা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করার ইচ্ছে।

১৪ই এপ্রিল।

কাল সারারাত নিউটনটা কেঁদেছে। বলটা আনার পর থেকেই লক্ষ্য করছি তার মেজাজটা যেন কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। কাল সারা দিনে অনেকবার দেখেছি সে একদৃষ্টে বিরক্তভাবে কাঁচের ঢাকনাটার দিকে চেয়ে আছে। কী কারণ কে জানে।

ঘুমের অভাবেই বোধহয়—আমার মাথাটাও কেমন জানি একটু ধরেছিল। তাই ল্যাবরেটরিতে যাবার আগে আমার তৈরি সেই বড়ির একটা খেয়ে নিলাম। দুশো সাতাত্তর রকমের ব্যারাম সারে আমার তৈরি এই 'অ্যানাইহিলিন' ট্যাবলেটের গুণে।

আমার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে প্রথমে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। কতকগুলি কাঁচের বৈয়ামের মধ্যে আমার ছোট ছোট পোকামাকড়ের

একটা সংগ্রহ ছিল—ইচ্ছে ছিল মাইক্রোসোনোগ্রাফে তাদের ভাষা শুনে রেকর্ড করব। এখন দেখি প্রত্যেক বৈয়ামের প্রত্যেকটি পোকা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

এটা অবিশ্যি আমার ভুলে হয়েছে। বলের এই মারাত্মক ক্ষমতার কথা জেনেও সেগুলোকে সরিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম! কী আর করি? মরা পোকাগুলোকে ফেলে দিয়ে খালি বৈয়ামগুলো যথাস্থানে রেখেছিলাম।

এবার বলটার দিকে চেয়ে দেখি—গত কদিন সকালে যে রকম রং দেখেছি, আজও ঠিক সেই রকম। রং বদলানোর নিয়মের কোন পরিবর্তন নেই দেখে আশ্বস্ত হলাম। এ জিনিসটা বেনিয়মে বা খামখেয়ালির ভাবে হলে গবেষণার খুব মুশকিল হত।

কাঁচের ঢাকনার গায়ে বাষ্প জমে কাঁচের সর্বাঙ্গ বিন্দু বিন্দু জলে ভরে গিয়েছিল আমি তাই ঢাকনাটা তুলে সেটা পরিষ্কার করতে গেছি। এমন সময় ল্যাবরেটরির দরজার দিক থেকে একটা শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি, নিউটন দরজার চৌকাঠের উপর পিঠ উঁচিয়ে লেজ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার দৃষ্টি বলের দিকে।

নিউটন যে একটা লম্ফ দেওয়ার আয়োজন করছে সেটা আমি দেখেই বুঝেছিলাম, এবং আমি সেটার জন্য প্রস্তুতও ছিলাম। লাফটা দিতেই আমি বিদ্যুদ্বেগে বলটার সামনে গিয়ে খপ্ করে দু'হাতে বেড়ালটাকে ধরে নিলাম। তারপর তাকে ল্যাবরেটরির বাইরে বার করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

বাকি যেটুকু সময় ল্যাবরেটরিতে ছিলাম, দরজায় নিউটনের আঁচড়ের শব্দ পেয়েছি। সামান্য একটা মাটির বলের উপর বেড়ালের এ আক্রোশ ভারি রহস্যজনক।

আজ সারাদিন আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফ চালিয়ে নানান সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শব্দের চার্ট করেছি, আর সমস্ত শব্দই আমার টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করেছি। এই শব্দ সংগ্রহ শেষ হলে পর, শব্দের

মানে করার পর্ব স্থুরু হবে। অবিনাশবাবু বলেছিলেন বিজ্ঞানের নাকি একটা সীমা আছে। হায়রে! কত যে জানবার বিষয় এখনও পড়ে আছে জগতে, অবিনাশবাবু তার কী বুঝবেন?

এখন রাত একটা। এবারে ঘুমোতে যাব। কিছুক্ষণ থেকেই যন্ত্রটার কথা ছেড়ে বার বার বলটার কথা মনে হচ্ছে।

ওই যে রং পরিবর্তনের ব্যাপারটা—ওটার মধ্যে কিসের জানি একটা ইঙ্গিত রয়েছে। কিসের সঙ্গে যেন ওর একটা সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্যটা যেন আমার ধরতে পারা উচিত, কিন্তু আমি পাচ্ছি না। সাদা অবস্থায় বলটা যদি বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তাহলে অন্য অবস্থাগুলো কী? সবুজ, লাল, হল্‌দে, কমলা—এগুলো তাহলে কিসের রং? এই রং পরিবর্তনের কারণ কী? আমি যদি না বুঝলাম তাহলে বুঝবে কে?

হয়ত কাল থেকে গবেষণার কাজ শুরু করলে ওর রহস্য ধরা পড়বে। হয়ত ব্যাপারটা আসলে অত্যন্ত সহজ। ক্রমাগত জটিল জিনিস নিয়ে মাথা ঘামালে অনেক সময় সহজ সমস্যার সামনে পড়ে কেমন জানি সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। আমার মত বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও এটা অসম্ভব নয়।

যাক্‌গে। আজ আর ভাবব না। কাল দেখা যাবে।

১৫ই এপ্রিল।

আমার জীবনে যত বিচিত্র, বীভৎস, অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটেছে, অন্য কোন বৈজ্ঞানিকের জীবনে তেমন ঘটেছে কি? জানি না। এক এক সময় মনে হয় আমি সাহিত্যিক হলে এসব ঘটনা আরো সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারতাম। কিন্তু তার পরেই মনে হয়, যে অত গুছিয়ে লেখার দরকার কী?

আমি ত আর বানানো কাল্পনিক ঘটনা লিখছি না—আমি লিখছি ডায়রি। সোজা কথায় সরল ভাবে আমার জীবনে যা

ঘটেছে তাই লিখছি। সেখানে অত ভাষার বাহারের প্রয়োজন আছে কি?

যাই হোক এবার যথাসম্ভব পরিষ্কার করে ঠাণ্ডা মাথায় এই কিছুক্ষণ আগেকার ঘটনাটা লেখার চেষ্টা করা যাক।

কাল রাত্রে ডায়রি লেখা শেষ করে বিছানায় শুয়ে তারপর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। আমি কাল লিখেছিলাম, যে এই রং বদলানোর ব্যাপারটার মধ্যে বিশেষ যেন ইঙ্গিত ছিল সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে ওটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে একটা যেন আলো দেখতে পেলাম। তারপর রঙের পরিবর্তনগুলো আরেকবার ঝালিয়ে নিলাম মনের মধ্যে। মাঝ রাত্তিরে বলটা সাদা তারপর সকালের দিকে ক্রমে সাদাটা চলে গিয়ে হল্‌দে লাল সবুজ ইত্যাদি বেশ একটা জমকালো রঙের খেলা শুরু হয়। দুপুর যত এগিয়ে আসে তত সবুজটা গাঢ় হতে থাকে, হল্‌দে লাল ইত্যাদি উজ্জ্বল রংগুলো কমে গিয়ে বলটা ক্রমশ একটা গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ চেহারা নেয়। তারপর বিকেলের দিকে সবুজ জায়গাগুলো আস্তে আস্তে লাল আর খয়েরী মেশানো একটা অবস্থায় পৌঁছে শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যের দিকে একটা ছাই-ছাই ভাব, এবং রাত বাড়লে পর সাদার ছোপ ধরা শুরু।

কিসের সঙ্গে মিল এই পরিবর্তনের?

আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে—বৈঠকখানার দেয়ালের ঘড়িতে দুটো বাজার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের উত্তরটা হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকের মত মাথায় এসে গেলো।

তফাৎ কেবল এই যে, পৃথিবীতে যে পরিবর্তন ঘটতে একবছর লাগছে—এই বলের সেটা ঘটতে লাগছে এক দিন, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা। রাত বারোটায় এই বলের চরম শীতের অবস্থা, যখন এর সবটাই বরফের আবরণে ঢাকা। তারপর সেটা কমে গিয়ে সূর্যোদয়ের সময় থেকে লাল হল্‌দে সবুজের খেলায় এর বসন্তকাল। সূর্য যতই মাথার

ওপরে উঠতে থাকে এই বল ততই গ্রীষ্মের দিকে এগোয় আর রঙের বাহারও কমে আসে। গ্রীষ্মের পর বিকেলের দিকে বর্ষা এলে বলঠায় হাত দিলে ভিজে ভিজে ঠেকে। সূর্যাস্তের সময় থেকে এর শরৎ, সন্ধ্যা বাড়লে প্রথম সাদার ছোপে হেমন্তকাল এবং সেই সাদা বেড়ে গিয়ে মাঝরাত্রে রাত বারোটাতে আবার চরম শীতের অবস্থা।

এই বলটি কি তাহলে আমাদের পৃথিবীরই একটা খুদে সংস্করণ?

নাকি, এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রহ—সেখানে ঋতু পরিবর্তন আছে, প্রাণ আছে, প্রাণী আছে?

আমি জানি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসম্ভব বলে প্রায় কিছুই নেই—কিন্তু ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র গ্রহের কথা যে আমি পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি!

আমার চিন্তাধারা হয়ত অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলত—কিন্তু একটা অদ্ভুত শব্দের ফলে তার গতি ব্যাহত হল।

শব্দটা আসছে একতলা থেকে। সম্ভবতঃ আমার ল্যাবরেটরি থেকেই।

নিউটন আজ আমার ঘরেই শুয়ে ছিল—সেও দেখি শব্দটা শুনেই কান খাড়া করে সোজা হয়ে উঠে বসেছে। ওর হাবভাব দেখে আমি ওকে কোলে তুলে নিলাম। তারপর ওকে নিয়ে একতলায় রওনা দিলাম ল্যাবরেটরির উদ্দেশ্যে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই শব্দটা আমার কানে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

'শঙ্কু! শঙ্কু! শঙ্কু!'

আমার নামটা ধরে কে যেন বারবার চিৎকার করে যাচ্ছে। উচ্চারণ স্পষ্ট হলেও, স্বর কিন্তু একেবারেই মানুষের স্বর নয়, কিম্বা মানুষ হলেও, আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে এমন কোন মানুষের মত নয়।

ল্যাবরেটরির দরজা খুলে ঢুকতেই শব্দটা যেন চারগুণ বেড়ে গেল। আর নিউটনের সে কি প্রচণ্ড আস্ফালন। কোম রকমে তাকে বগলদাবা করে এগিয়ে গেলাম আমার টেবিলের দিকে। শব্দটা আসছে আমার যন্ত্রটা থেকে—বলের দিক থেকে নয়।

আমি এসে দাঁড়াতেই চিৎকারটা থেমে গেলো।

তারপর প্রায় আধ মিনিট সব চুপচাপ। আমার বগলের তলায় বুঝতে পারলাম নিউটন থর থর করে কাঁপছে।

হঠাৎ আবার তীক্ষ্নস্বরে সেই চিৎকার শুরু হল।

'টেরাটম্! টেরাটম্! টেরাটম্ গ্রহ থেকে বলছি। কলির শঙ্কু! কলির শঙ্কু! তুমি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ?'

আমি কি বলব? আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করাই যে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

আবার প্রশ্ন এলো—'শঙ্কু, আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমার মাইক্রোসোনোগ্রাফে যে ওয়েভলেংথ রয়েছে সেই ওয়েভলেংথেই আমরা কথা বলছি। শুনতে পাচ্ছ ত 'হ্যাঁ' বল—আরো কথা আছে।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত বললাম, 'পাচ্ছি শুনতে। কি বলবে বল।'

উত্তর এলো, 'আমরা তোমার ঘরে বন্দী। বুঝতে পারছি, তুমি না জেনে এ কাজ করেছ। কিন্তু করে অন্যায় করেছ। আমরা সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ। কিন্তু তাতে তাচ্ছিল্য করার কোন কারণ নেই; পৃথিবীর চেয়ে পাঁচ লক্ষ গুণ বড় গ্রহও সৌরজগতের বাইরে রয়েছে। আমাদের শক্তি আমাদের আয়তনে নয়। আমাদের শক্তি আমাদের বিজ্ঞানে, আমাদের বুদ্ধিতে। তোমাদের পৃথিবীর যা সম্পদ, সে অনুপাতে আমাদের টেরাটম গ্রহের সম্পদ লক্ষ গুণে বেশী। আমরা কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়েছি। জলের মধ্যে পড়েছিলাম, তাই আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি, কারণ আমরা মাটির নীচে বাস করি। কিন্তু তোমার এই কাঁচের আচ্ছাদন আমাদের

পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ অক্সিজেন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের যেমন এ জিনিষটা দরকার, তেমনি আমাদেরও। এমনিতে মানুষের সঙ্গে আমাদের তফাৎ সামান্যই, তবে আমাদের বুদ্ধি অনেক গুণে বেশি, আর আয়তন আমাদের এতই ছোট যে তোমাদের সাধারণ মাইক্রস্কোপে আমাদের দেখা যাবে না।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা থামল। আমি যে এর মধ্যে কখন চেয়ারে বসে পড়েছি তা নিজেই ঠাহর পাইনি। তারপর আবার কথা শুরু হল।

'তোমার কাছে আমাদের অনুরোধ—কাঁচের আচ্ছাদন খুলে ফেলো। আমাদের আয়ু এমনিতেই কমে এসেছে! একটা আস্ত গ্রহের সমস্ত অধিবাসীদের হত্যা করার অপরাধের ভার কি তুমি সারাজীবন বইতে পারবে? তাই অনুরোধ করছি—আমাদের মুক্তি দাও। তুমি বৈজ্ঞানিক। আমাদের সম্বন্ধে তোমার মনে কোন-রকম সহানুভূতির ভাব নেই?'

একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছিল এবারে সেটা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

'তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন ক্ষমতা আছে যাতে তোমরা তোমাদের চেয়ে আয়তনে অনেক বড় প্রাণীকেও হত্যা করতে পার?'

কিছুক্ষণ কোন উত্তর নেই। আমি বললাম, 'আমার প্রশ্নের জবাব দাও। গত কদিনের মধ্যে তোমাদের কাছাকাছি কতগুলি প্রাণীর যে মৃত্যু হয়েছে—তার জন্য কি তোমরা দায়ী?'

এবারে আমার প্রশ্নের উত্তরে একটা পাল্টা প্রশ্ন এলো—'ভাইরাস কাকে বলে জানো?'

'নিশ্চয়ই।'

'কাকে বলে?'

আমার ভারি অপমান বোধ হচ্ছিল, তাও উত্তর দিলাম,—'রোগ বহনকারী বিষাক্ত বীজকে বলে ভাইরাস।'

'ঠিক। এই ভাইরাসের আয়তন কী?'

'মাইক্রস্কোপে দেখতে হয়।'

'ঠিক। কিন্তু এই বীজ থেকে একটা গোটা শহরের লোক নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে পারে সেটা জান?'

'শুধু শহর কেন? একটা সম্পূর্ণ দেশের লোকসংখ্যা লোপ পেয়ে যেতে পারে। মহামারীর কথা কে না জানে?'

'ঠিক। এখনও কি বুঝতে পারছ না আমাদের ক্ষমতা কোথায়?'

'তোমরা কি ভাইরাস ছড়িয়ে দাও?'

'ছড়িয়ে দেবো কেন?'

'তাহলে?'

কোন উত্তর নেই। আমি অনুভব করলাম আমার ভেতরের জামাটা ঘামে ভিজে উঠেছে। একটা সাংঘাতিক সন্দেহ মনের মধ্যে জেগে উঠেছে।

এ গ্রহের অধিবাসীরা কি তাহলে এক একটি মূর্তিমান ভাইরাস?

তাই যদি হয়, তাহলে এদের মুক্তি দিলে ত এরা সমস্ত পৃথিবীকে —'তিন মাসের মধ্যে।'

আমি চমকে উঠলাম। আমার কোন্ প্রশ্নের এরা জবাব দিচ্ছে? আমি ত কোন প্রশ্ন করিনি এদের!

এবারে একটা ক্ষীণ হাসির শব্দ পেলাম—সে হাসি এক অপার্থিব বিদ্রূপে ভরা। তারপর কথা এলো—

'আমরা মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি। তুমি ভাবছ সমস্ত পৃথিবীকে রোগাচ্ছন্ন করার শক্তি আছে কি না আমাদের।'

'আমি উত্তরে বলছি—আছে। শুধু তাই নয়—সমস্ত পৃথিবীকে তিন মাসের মধ্যে আমরা জনশূন্য করে দিতে পারি। সংক্রামক রোগের জন্য ত আর হাঙ্গাম করতে হয় না। আমাদের একজনের চেষ্টাতেই সমস্ত গিরিডি শহরটা ফাঁকে করে দিতে পারি। আর সকলে মিলে যদি একজোটে লাগি তাহলে......।'

গলার স্বরটা যেন কেমন ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেটা কি যন্ত্রের দোষ ?

আবার উত্তর এলো—'না, তোমার যন্ত্র ঠিক আছে। আমরাই দুর্বল হয়ে পড়েছি। কাঁচের ঢাক্‌না না খুললে আমরা আর বাঁচব না আমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে তুমি—প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু! এই খুনের জন্য অবিশ্যি তোমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না। কিন্তু বিবেক বলে কি তোমার কিছুই নেই। একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কি এতটা নিষ্ঠুরতা সম্ভব? ভেবে দেখ শঙ্কু, ভেবে দেখো।'

'তোমাদের যদি মুক্তি দিই, তাহলে পৃথিবীর মানুষের ওপর থেকে তোমাদের আক্রোশ যাবে কী? তোমাদের বিশ্বাস করবো কি করে?'

এ প্রশ্নের জবাব এলো না। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার পর আমার যন্ত্রের ভিতর থেকে আসতে আরম্ভ করল এক বীভৎস আর্তনাদের কোরাস। কত কণ্ঠ সে কোরাসে মিলেছে জানি না। কিন্তু সেটা যে আর্তনাদ, এবং তাতে যে তীব্র যন্ত্রণার ইঙ্গিত রয়েছে তাতে কোন ভুল নেই।

'শঙ্কু! শঙ্কু!'

সমস্ত আর্তনাদ ছাপিয়ে আবার সেই কথা।

'শঙ্কু! শঙ্কু! শঙ্কু!'

'কী বলছ?'

'কাঁচের ঢাকনা খুলে দাও, খুলে দাও! আমরা মরতে চলেছি। আমাদের প্রাণ তোমার হাতে। হত্যার দায়ে পোড়ো না। সারাটা জীবন বিবেকের জ্বালা……'

কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এলো।

আমি যেমন চেয়ারে বসে ছিলাম, তেমনি বসে রইলাম। একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও

আমার কর্তব্য কী সেটা বুঝতে পারছিলাম। কাঁচের ঢাকনা খোলা চলে না। টেরাটম্ গ্রহের প্রাণীদের বাঁচাতে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীর লোকের জীবন বিপন্ন করা চলে না।

আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফে শব্দ কমে আসছে। কথা থেমে গেছে—এখন কেবল তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

সেই আর্তনাদ ক্রমশ হাহাকারে পরিণত হল।

তারপর সে হাহাকারও মিলিয়ে গিয়ে রইল এক নিস্তব্ধতা।

আমি আরো মিনিটখানেক অপেক্ষা করে আমার যন্ত্রের স্যুইচটা বন্ধ করে দিলাম।

তারপর আস্তে আস্তে বলটার কাছে হেঁটে গিয়ে কাঁচের ঢাকনাটা তুলে ফেললাম।

ঘড়িতে ভোর পাঁচটার ঘণ্টা বাজছে।

কিন্তু টেরাটমে বসন্তের রং ধরেনি। তার বদলে যেন একটা মেটে রুক্ষতা।

আমি বলটাকে তুলে নিয়ে নিউটনের দিকে চাইলাম। সেও দেখি একদৃষ্টে বলটার দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু আগের সেই আক্রোশের কোন ইঙ্গিত পেলাম না তার দৃষ্টিতে। আমি বললাম, 'তুই খেলবি বলটাকে নিয়ে? নে খেল।'

বলটা মাটিতে রাখতে নিউটন এগিয়ে এলো। তারপর তার ডান হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করতেই সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ ফেটে চৌচির হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল!

---

* সদ্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ 'প্রোফেসর শঙ্কু' থেকে পুনর্মুদ্রিত। বইখানি 'আশ্চর্য!' কার্যালয় থেকে কেনা যাবে। দাম ৪'৫০ ; সডাক ৫'১০ প।

জার্নি টু দি সেণ্টার অভ দি আর্থ

জুল্‌স ভের্নের সম্পূর্ণ উপন্যাসের সারাংশ

অদ্রীশ বর্ধন

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের রঙীন সিনেমাস্কোপ ছবি॥ এস্ এফ সিনে ক্লাবের প্রদর্শনী : প্রাচী সিনেমায় ১৯শে মার্চ, ১৯৬৭. সকাল ৯টা এবং ১টা॥

॥ রুনিক হরফের ম্যাজিক ॥

জার্মানীর হামবুর্গ শহরের অধ্যাপক লিডেনব্রক আমার কাকা। পণ্ডিতমানুষ। পঞ্চাশ বছর বয়স। বাড়ীতে ছিল বুড়ি ঝি মার্থা। কাকার ধর্মকন্যা গ্রোবেন হোস্টেলে থাকত। সাতদিনে একবার বাড়ী আসত।

সেদিন পনেরোই মে। হন্তদন্ত হয়ে কাকা বাড়ী এলেন। "অ্যাকজেল অ্যাকজেল" করে চেঁচাতে লাগলেন। গিয়ে দেখি তাঁর হাতে একটা দুষ্প্রাপ্য বই। সবচাইতে অবাক কাণ্ড, বইটার মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট বিরঙ হলদে রঙের কাগজ মেঝে ছিটকে পড়ল। পাঁচ ইঞ্চি চওড়া, তিন ইঞ্চি চওড়া কাগজটায় কি সব হিজি-বিজি লেখা।

কাকা বিড়বিড় করতে লাগলেন—"রুনিক হরফ। কিন্তু মানেটা বোঝা যাচ্ছে না কেন ?"

ভাবতে ভাবতে কাকা পাগলের মত হঠাৎ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খেয়ে দেয়ে আমি চিরকুটটা নিয়ে বসলাম। এবং দৈবাৎ শেষ লাইনের শেষ হরফ থেকে পড়া শুরু করে ডান দিকে থেকে বাঁ দিকে আসতেই হেঁয়ালির অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল।

মাথা ঘুরে গেল আমার। অর্থ অতি সাংঘাতিক। কাকা শুনলেই ছুটবেন। তাই চিরকুটটা পুড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছি এমন সময়ে

কাকা ফিরে এলেন। এসেই চিরকুট নিয়ে সেই যে বসলেন, একদম রাত কাবার।

সারারাত উপোস করে না ঘুমিয়েও হেঁয়ালির অর্থ বার করতে পারলেন না কাকা। সকালবেলা ওঁর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে আর থাকতে পারলাম না। বললাম, কি ভাবে হেঁয়ালির সমাধান করতে হবে। শুনেই গড়গড় করে কাকা নিজেই পড়ে ফেলল।

"হে নির্ভীক পর্যটক! স্কার্টারিস পর্বতশীর্ষের ছায়া পড়বে স্নেফেল আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর জুলাই মাসের গোড়ার দিকে। তখন সে পথে নীচে নামলেই তুমি পৃথিবীর জঠরে পৌঁছোতে পারবে। আমি সেই পথে গিয়েছিলাম।—আরন্‌ সাক্‌নুস্যউজম্‌।"

নাচতে নাচতে কাকা বললেন—"মালপত্তরগুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে।"

॥ বৈজ্ঞানিকের খেয়াল ॥

খেতে বসে কাকা বললেন—"স্নেফেল আগ্নেয়গিরি হল আইসল্যাণ্ডে। ১২১৯ সালে স্নেফেল শেষবারের মত আগুন বমি করেছিল। তারপর থেকে সরে গেছে।"

আমি বললাম—"বিজ্ঞান বলে পৃথিবীর ভেতরে ভীষণ গরম। যত নীচে নামা যাবে, উত্তাপ ততই বাড়বে। প্রতি সত্তর ফুট নামলে এক ডিগ্রী উত্তাপ বাড়ে। সেই হিসেবে পৃথিবীর মাঝখানের উত্তাপ দাঁড়ায় তিনলক্ষ ষাট হাজার বত্রিশ ডিগ্রীর কাছাকাছি। তাছাড়া পৃথিবীর তিনমাইল তলা পর্যন্ত মাটি বালি কাদা। তারপরেই সব জ্বলন্ত তরল পদার্থ।"

"তোর মুণ্ডু।" রেগেমেগে বললেন কাকা। "বিজ্ঞান এখনও শিশু। প্রফেসর পোঅঁসে বলেছেন, পৃথিবীর ভেতরে যদি অত উত্তাপ থাকত, তবে এই ত্রিশ মাইল পুরু আবরণের ক্ষমতা ছিল না তাকে আটকে রাখার। সব গুঁড়ো করে গরম বাইরে বেরিয়ে আসত।

১৮২৫ সালে স্যার হামফ্রি ডেভিকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম পৃথিবীর ভেতরটা তরল থাকতে পারে।"

"কি করে?"

"চাঁদের টানে সমুদ্রজলে জোয়ার ভাঁটা খেলে। পৃথিবীর ভেতরটাও যদি তরল পদার্থে বোঝাই থাকত, তাহলে দিনে দুবার করে তা জোয়ারের মত ফুলে উঠত। আর ঠিক দিনে দুবার ভূমিকম্প ইত্যাদি হত।"

এই ঘটনার একদিন পরেই আমাকে নিয়ে একগাদা মালপত্র গাড়ীতে চাপিয়ে কাকা রওনা হলেন স্টেশনের দিকে।

॥ আইসল্যাণ্ড ॥

আইসল্যাণ্ডের রাজধানী রিজকিয়াভিকে পৌঁছে উঠলাম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ফ্রিদিকসনের বাড়ীতে।

কথায় কথায় ফ্রিদিকসনই বললেন—"আরন্ সাকৃন্যুউজম ছিলেন ষোলো শতকের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক। যে কোনো ধাতুকে তিনি সোনা করতে পারতেন। কিন্তু ধর্মের জিগির তুলে ১৫৭৩ সালে তাঁর সব বই পত্তর পুড়িয়ে ফেলা হয়।"

কাকা আসল কথাটা ভাঙলেন না। কায়দা করে জেনে নিলেন স্নেফেলে যাওয়াটার হদিশ। সেই সঙ্গে একজন গাইডের ব্যবস্থাও হল। নাম তার হ্যান্স্।

ফ্রিদিকসন কিন্তু জানতেও পারলেন না পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিযান চালানোর মতলব এঁটেছেন আমার ছিটগ্রস্ত কাকা!

॥ অভিযান ॥

অনেক কষ্টে পৌঁছানো গেল স্নেফেলের সানুদেশে। তেইশে জুন শুরু হল পাহাড়ে ওঠা। স্নেফেলের উচ্চতা পাঁচহাজার ফিট। দু'দুটো প্রকাণ্ড চূড়ো মেঘ ফুঁড়ে উঠে গেছে।

চারদিকে ছড়ানো খনির আকরের মধ্যে দিয়ে উঠতে লাগলাম।

ভূতাত্ত্বিকরা বলেন, আইসল্যাণ্ড আগে ছিল সমুদ্রের তলায়। ভূমিকম্পের ঠেলায় জল থেকে মাথা তুলেছে। ভূত্বক কিন্তু এখনো লাভায় ঢাকা।

সন্ধ্যে সাতটায় চার হাজার ফিট ওপরে উঠলাম আধমরা অবস্থায়। রাত বারোটার সময়ে পৌঁছোলাম চূড়োয়। মাঝরাতের সূর্যালোকে তখন চারদিক আলোকিত। অপরূপ সেই আলো। স্নিগ্ধ। সোনালী!

॥ আইসল্যাণ্ডের বিজ্ঞান-পাগল সেই মানুষটি ॥

ঘুম ভাঙল পরদিন বেলা দুপুর নাগাদ। পশ্চিমদিকে কুয়াশার মত কি যেন একটা দেখা যাচ্ছিল। কাকা বললেন—"গ্রীনল্যাণ্ড।"

হ্যানসের কাছে জানা গেল যে চূড়োটার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে তার নাম স্কার্টারিস।

সঙ্গে সঙ্গে কাকা আমাদের নিয়ে তার মধ্যে নামতে শুরু করলেন। পাতালের মত প্রশান্ত একটা জায়গায় পৌঁছে দেখা গেল আগ্নেয়গিরির সর্বনেশে তিনটে জ্বালামুখ হাঁ করে রয়েছে। এক-একটার পরিধি প্রায় শ'খানেক ফিট।

কাকা ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলেন। তারপরেই বিকট এক চীৎকার।

দৌড়ে গিয়ে দেখি বড় একটা পাথরের সামনে বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে আমার খুড়োমশায়। পাথরটার গায়ে রুনিক হরফে খোদাই করা এই কয়েকটি অক্ষর :

॥ আর্‌ন্ সাকন্যুউজম ॥

আর্‌ন্ সাকন্যুউজম্! অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম আমি। আইসল্যাণ্ডের সেই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক যে এই পথ দিয়েই পৃথিবীর জঠরে পৌঁচেছিলেন, তার প্রমাণ জ্বল জ্বল করতে লাগল আমার সামনে।

রাত নামল গহ্বরের মধ্যে। চাতালের ওপর ক্লান্ত শরীর নিয়ে পড়লাম আমরা।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখি কাকার মুখ অন্ধকার। আকাশ মেঘলা। রোদ্দুর নেই। তাই স্কার্টারিসের ছায়াও নেই।

পর পর তিনদিন আকাশ মেঘলা রইল। তারপর সোনালী আলোয় ঝলমল করে উঠল চারদিক। দুপুর হল। এক সময়ে স্কার্টারিসের ছায়া সরে সরে এসে পড়ল একটা জ্বালামুখের ওপর।

হৈ-হৈ করে উঠলেন কাকা। এই জ্বালামুখ দিয়েই এবার পাতালে প্রবেশ করব আমরা।

॥ পাতালপুরীর প্রবেশ পথ ॥

খাঁজকাটা পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম আমরা। অতি-কষ্টে কখনো চারশো ফুট দড়ি ঝুলিয়ে, কখনো হাঁচর-পাঁচর করে নেমে এলাম দুহাজার আটশো ফিট। তখন রাত দুপুর। তাই সেই খ্যানেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙাতেই কাকা বললেন—"আমরা এখন ঠিক সমুদ্রের সমতলে আছি। এই ছাখ ব্যারোমিটার। ভূপৃষ্ঠের মত এখানেও চাপ সমান। যখন বাতাসের চাপ ব্যারোমিটারে মাপা যাবে না, ম্যানোমিটারে মাপতে হবে, তখনি বোঝা যাবে আমরা সত্যিই পৃথিবীর পেটে ঢুকে পড়েছি।"

টর্চ জ্বালিয়ে আবার পাতালপুরীর মধ্যে নামতে লাগলাম।

১২২৯ খৃষ্টাব্দে শেষবার অগ্ন্যুদ্গীরণ ঘটেছিল স্নেফেলে। তার চিহ্ন আশপাশেই দেখলাম। জমাট বেঁধে যাওয়া লাভার স্রোত ঝকমক করতে লাগল টর্চের আলোয়। অসংখ্য কার্তজোপলের স্বচ্ছ ফানুষ তুলছিল মাথার ওপর। যেন অগুন্তি চকচকে কাঁচ বসানো তাদের গায়ে। যেন লক্ষ লক্ষ ঝাড় লণ্ঠন। টর্চের আলোয় সহস্র রঙে রঙীন হয়ে ঝলমল করতে লাগল সেই ঝাড়ের সারি। লাল,

নীল, সবুজ, হলুদ— নানা রঙের ফসিলের ওপর আলো ঠিকরে পড়ে যেন কল্পনাতীত রামধনু সৃষ্টি করল পাতালপথে।

সেদিন রাতে খেতে বসে কাকা জানালেন আমরা সমুদ্রতলের চেয়েও দশ হাজার ফিট নীচে নেমে এসেছি।

পরদিন ভোরবেলা দুটো সুড়ঙ্গপথের সামনে এসে দাঁড়ালাম। পূবদিকের পথে পা বাড়িয়ে এগোলাম অনেকদূর, দুপুরের দিকে দেখা গেল, এককালে যে পথে লাভার স্রোত বয়ে গেছিল, এ পথ সে পথ নয়। কেননা, সুড়ঙ্গের গা পাষাণময়। চূর্ণোপল আর স্লেট পাথরে ছাওয়া। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল আমরা বালির ওপর দিয়ে চলেছি। এখানে নদী নেই, সমুদ্র নেই, তবে বালি এল কোত্থেকে? একটু পরেই প্রাচীরগাত্রে উদ্ভিদ জগতের অভ্রান্ত চিহ্ন দেখা গেল। একটু পরেই একটা ট্রিলোবাইট জাতের ঝিনুক, কুড়িয়ে পেলাম।

কাকা বললেন—"আমরা পথ হারিয়েছি গ্রন্থিপ্রস্তর আর অগ্ন্যুদগারের প্রাচীর ছাড়িয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পথ হারিয়েছি। হারিয়েছিই যখন, তখন দেখে আসা যাক এ পথের শেষ কোথায়।"

"কিন্তু জল?" চিঁ চিঁ করে বললাম আমি।

"উপায় নেই। অল্প অল্প করে খেতে হবে।"

॥ পথের শেষ নেই, পথের শেষ নেই ॥

এবার এসে পৌঁছোলাম মারবেল পাথরের রাজত্বে। সাদা, লাল, নীল, হলুদ, বেগুনী নানান রঙের পাথর। কোথাও ছড়ানো বিভিন্ন জাতের মাছ আর সরীসৃপের কঙ্কাল ছড়ানো। বুঝলাম, আমরা ক্রমশ সৃষ্টির আদিযুগের দিকে চলেছি।

পর দিন এসে পৌঁছোলাম এমন জায়গায় যেখানে সুড়ঙ্গ-প্রাচীর ঘন কালো রঙের আস্তরণে ঢাকা। প্রাচীরের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখলাম হাত কালো হয়ে গেছে।

"কয়লার খনি! কয়লার খনি!" চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

পরদিন একটা গহ্বরের মধ্যে ঢুকে সারাদিন পথ চলে একটা নিরেট পাঁচিলের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম সন্ধ্যে নাগাদ।

এ পথের শেষ এইখানেই। হাতে মাত্র একদিনের পানীয় জল মজুদ। অথচ ফিরতে হবে পাঁচ দিনের পথ।

॥ অন্য পথ ॥

পাঁচ দিন যে কিভাবে কাটল, তা বলে বোঝানো যাবে না। দুই সুড়ঙ্গের মোহানা পথে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান ফিরলে আবার অন্য সুড়ঙ্গ পথে নামতে লাগলাম। এবার কখনো গাঢ়, কখনো ফিকে নীল রঙের শ্লেট পাথরের প্রাচীর, প্রাচীরের গায়ে কোথাও সোনা, কোনখানে বা প্লাটিনামের চিহ্ন সরু সুতোর মত। কোনখানে আবার প্লাটিনামের আর সোনার সুতো বিনুনীর মত প্রাচীরের গায়ে। শ্লেট পাথরের পর স্বচ্ছ স্ফটিকের ধাতব পদার্থের গ্রন্থি-প্রস্তর। রাশি রাশি অভ্র আমাদের টর্চের আলোয় হীরের মত ঝকমক করতে লাগল।

রাতে অজ্ঞানের মত পড়েছিলাম। কাকামণি টেনে তুললেন। হ্যানসের সঙ্গে হাজার দুই ফিট নীচে নেমে রুদ্ধশ্বাসে শুনলাম গ্রন্থি পাথরের কঠিন দেওয়াল ভেদ করে দূরাগত বজ্রনির্ঘোষের মত কি যেন এক গুরুগম্ভীর শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে জলকল্লোল। মনে হল দেওয়ালের ওপাশ দিয়ে একটা সঞ্জীবনী ঝরণাধারা বহে চলেছে।

আরও মাইলখানেক নীচে নেমে গাঁইতি দিয়ে পাথরের বুকে ঘা মারল হ্যান্‌স। হঠাৎ তীব্র শোঁ শোঁ শব্দে বিদ্যুৎবেগে একটা জলধারা ছুটে এল।

জল ছুঁয়ে দেখি আগুনের মত গরম টগবগে। উষ্ণ বাষ্প ভরে গেল সারা সুড়ঙ্গ। প্রচণ্ড বেগে পাতাল অভিমুখে ধেয়ে চলল জল স্রোত।

সেই জল ঠাণ্ডা করে নিয়ে আমরা আকণ্ঠ পান করলাম। তার পর পাতালমুখী জল স্রোথ অনুসরণ করে নেমে চললাম নীচে।

॥ পথ হারিয়ে ॥

আমি পথ হারালাম। অন্যমনস্ক হয়ে চলতে হঠাৎ খেয়াল হতেই দেখি কাকা আর হ্যান্‌স্ কাছে। কত চেঁচালাম, সাড়া পেলাম না। ছুটোছুটি করে যখন নেতিয়ে পড়েছি, তখন হঠাৎ শুনলাম 'অ্যাকজেল' 'অ্যাকজেল' বলে কে যেম ডাকছে।

শব্দটা যেন দেওয়াল ফুঁড়ে আসছিল। আমিও ডাকলাম। কাকা সাড়া দিয়ে দিলেন। তারপর দেওয়ালে মুখ লাগিয়ে কথাবার্তা কইলাম। জানালাম, জলের রেখাটা হারিয়ে ফেলায় মরতে বসেছি আমি।

কাকা বললেন—"তোর কাছে ফসফরাস দেওয়া ক্রনোমিটার আছে। তুই ঘড়ি ধরে আমাকে ডাক। আমিও ঘড়ি ধরে শুনছি! তারপর খেয়াল রাখ ঠিক কখন আমার ডাক শুনতে পাস। নে, ডাক।"

ডাকলাম আমি। একটু পরেই শুনলাম আমার নাম।

ঘড়ি দেখলাম, চল্লিশ সেকেণ্ড।

কাকা বললেন—"তাহলে শব্দ আসতে বিশ সেকেণ্ড লেগেছে। শব্দের গতি সেকেণ্ডে ১১২০ ফিট। তার মানে কুড়ি সেকেণ্ডে ২২৪০০ ফিট। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ব্যবধান সোয়া চার মাইল!"

অবাক হয়ে গেলাম আমি।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। কাকার নির্দেশে নীচের দিকে অন্ধের মত নামতে নামতে হঠাৎ হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম একটা গর্তের মধ্যে। জ্ঞান ফিরে পেলে দেখি মাথায় হাত বুলোচ্ছেন কাকা।

হন্তদন্ত হয়ে উঠে এগোতেই দেখলাম এক অসম্ভব দৃশ্য!

চোখ ধাঁধিয়ে গেল দিগন্তপ্রসারী উজ্জ্বল আলোয়।

সমুদ্র! সমুদ্র! পাতালপুরীর মধ্যে বিশাল সমুদ্র! সোনালি বালুকায় রূপালী ঢেউয়ের ঝিকিমিকি। কিন্তু পাতালসমুদ্র কেমন জানি নিষ্প্রাণ। চারপাশে যে উজ্জ্বল আলো তা সূর্যের বা চাঁদের নয়, অরোরা বোরিয়ালিসের মত এ এক আশ্চর্য আলো।

উপকূল ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখা গেল অতিকায় গাছের জঙ্গল, ১০০ থেকে ১৫০ ফিট উঁচু প্রত্যেকটা গাছ। পাথুরে জমিতে অসংখ্য ফাটল। তা থেকে জায়গায় জায়গায় বেরুচ্ছে উষ্ণ প্রস্রবণ।

সন্ধ্যে নাগাদ একটা ভেলা তৈরী করে ফেললাম।

॥ পাতাল সমুদ্রে অভিযান ॥

দিনের পর দিন সেই অজানা বিচিত্র সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে দেখেছি কত আশ্চর্য দৃশ্য, সম্মুখীন হয়েছি ভয়াবহ অ্যাডভেঞ্চারের। বিশদ বিবরণ দিতে গেলে একটা মোটা বই লিখে ফেলতে হয়। সংক্ষেপে তাই বলি।

এক জায়গায় হ্যানস ছিপ ফেলে মাছ ধরল। অদ্ভুত মাছ। আশ্চর্য চ্যাপটা মাথা, গোল মুখ, গায়ে বন-রুইএর মত শক্ত আঁশ। মুখে দাঁত নেই। পেছনে লেজ নেই। কাকা বললেন, এ হচ্ছে কোটি কোটি বছর আগেকার মাছ। মাছের কোন চোখ নেই। পণ্ডিতেরা এ মাছের তিনটে নাম দিয়াছেন—গ্যানোঅ্যাড, শ্রেফালাস পিডে আর প্টেরিকথ্যিস।

শূন্যে কিন্তু পাখী দেখিনি।

এক সময়ে এসে পড়লাম আলুথালু সমুদ্রে। চারিদিকে মারাত্মক অতিকায় জলজন্তু। কোথাও সামুদ্রিক গিরগিটি, কোথাও পঞ্চাশ ফিট লম্বা কচ্ছপ, কোথাও বিশাল সাপ, কোথাও প্রকাণ্ড কুমীর। অবশেষে লড়াই লাগল একশ ফিট লম্বা সাপ আর কালো কঠিন আঁশ বর্ম পরা কুমীরের মধ্যে। সেই ফাঁকে আমরা ভেলা নিয়ে সটকান দিলাম।

দিন কয়েক পরে একটা দ্বীপের কাছে পৌঁছোলাম। আসলে সেটা একটা আগ্নেয়গিরি। ঠিক মাঝখান থেকে ফোয়ারার মত গরম জল ঠেলে উঠছে বহু দূর পর্যন্ত। ফোয়ারার চারদিকে নীল বিদ্যুতের ঝিলিক খেলছে। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! বুঝলাম, দ্বীপটা ফাঁপা! ভেতরে গরম বাষ্প ভরা।

তারপর ঝড়ের মুখে ভেলা নক্ষত্র বেগে ছুটে চলল। একটা আগুনের বল কোত্থেকে হঠাৎ এসে পড়ল। ভয়াবহ নীলাভ উত্তপ্ত উজ্জ্বল বলের ছুটোছুটিতে মাস্তুল ছই সবই পুড়ে গেল। তারপরেই কি এক অলৌকিক শক্তিতে ভেলার লোহার জিনিসপত্রের মধ্যে আপনা থেকেই ঠোকাঠুকি লেগে গেল। আচম্বিতে ভয়ংকর শব্দে ফেটে গিয়ে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল অগ্নিপিণ্ডটা।

এসে পৌঁছোলাম একটা দ্বীপে। সেখানে দেখা গেল অসংখ্য নরকঙ্কাল, আর পশু কঙ্কাল। অর্থাৎ কোটি কোটি বছর আগে ভূচর প্রাণী সৃষ্টির আগেই মানুষ জন্ম নিয়েছিল। সেই কঙ্কালময় শ্মশানভূমি একসময়ে পেরিয়ে এসে পৌঁছোলাম এক বিশাল ঘন সন্নিবদ্ধ অরণ্যের সামনে। কিন্তু সমস্ত গাছই বিবর্ণ। বুঝলাম কারণটা রোদ্দুরের অভাব।

অরণ্যে ঢুকে চমকে উঠলাম। ম্যামথ জাতীয় অতিকায় হাতী ঘুরছে জঙ্গলে। আর একদিকে একটা আকাশ ছোঁওয়া ওক গাছের নীচে একটা জীবন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। দানবিক মূর্তি, লম্বায় চওড়ায় আমাদের চারগুণ। হাতে একটা রীতিমত বড়সড় গাছ। মাথাটা অনেকটা মোষের মত, মুখের ভাব বনমানুষের।

বুঝলাম হাতীদের রাখাল সে।

আমরা চোঁ-চাঁ দৌড়ে এসে পৌঁছোলাম সমুদ্রতীরে। সেখানে বেলাভূমিতে একটা ছোরা কুড়িয়ে পেলাম। কিছুদূরে পেলাম একটা সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের মুখে একটা পাথরে খোদাই করা মাত্র দুটি অক্ষর: এ, এস। অর্থাৎ আরন্ সাক্‌নুসেম্!

॥ প্রাণ নিয়ে টানাটানি ॥

হতভম্ব হয়ে গেলাম সবাই। আইসল্যাণ্ডের বিখ্যাত সেই বৈজ্ঞানিক তাহলে এখানেও এসেছিলেন! ছোরার ভোঁতা ফলা দেখেই বোঝা গেল এই ছোরা দিয়েই পাথরের বুকে নামের আদ্যক্ষর খোদাই করে গেছেন তিনি। এবং নিশ্চয় এই সুড়ঙ্গ পথেই পৌঁচেছেন পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে যা এখান থেকে আরও ৪৫০০ মাইল নীচে।

হাত চারেক চওড়া সুড়ঙ্গের পথে কিছুদূর ঢুকেই দেখলাম মস্ত একটা পাথর দিয়ে পথ আটকানো।

বারুদ দিয়ে পাথর উড়িয়ে পথ করে নেওয়ার মতলবটা আমার মাথাতেই এল। তৎক্ষণাৎ বারুদ ঢালবার জন্য গর্ত খোঁড়া শুরু হয়ে গেল। নাইট্রিক অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিডে তুলো ভিজিয়ে তৈরী করলাম মারাত্মক বিস্ফোরক।

তারপর এক সময়ে সলতেতে আগুন দিয়ে দৌড়ে ভেলায় এসে উঠলাম আমি। চল্লিশ গজ দূরে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল ভেলা। আর তারপরেই—

প্রচণ্ড শব্দে উড়ে গেল গুহার মুখ। নিমেষের মধ্যে যেন প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। তোলপাড় হয়ে গেল সমুদ্রের জল। ভেলাশুদ্ধ জলস্রোতে আমরা গুহার দিকে ভেসে গেলাম এবং পলকের জন্য দেখলাম হাঁ করা বিশাল এক গহ্বর।

বুঝলাম, পাথটার আড়ালে ছিল অতল একটা গর্ত। বারুদ ফেটে পাথর গুঁড়িয়ে দিতেই সমুদ্রের জল জলপ্রপাতের মতো ঢুকতে লাগল গহ্বরের মধ্যে। সেই সাথে আমরাও।

নক্ষত্র বেগে নীচের দিকে নামতে লাগল ভেলা। সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেললাম। গহ্বরের গায়ে ধাক্কা না লাগায় নিরন্ধ্র অন্ধকারেও বুঝলাম, গহ্বরটা সত্যিই প্রকাণ্ড।

হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল ভেলা। তীব্র বেগে একটা

জল ধারা পড়তে লাগল আমাদের ওপর। পরক্ষণেই ভেলাটা আবার ছুটে চলল। এবার আর নিচের দিকে নয়,—ওপর দিকে।

ঘণ্টায় প্রায় দশ মাইল বেগে ওপর দিকে শোঁ শোঁ করে উঠতে লাগল ভেলা।

কাকা বললেন—"গর্তটা জলে ভর্তি হয়ে যাওয়ায় এবার জলের ঠেলাতেই ওপরে উঠছি।"

কিন্তু সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল উত্তাপ। এতদিন পাতালে ছিলাম। কিন্তু এমন গরম কখনো কখনো অনুভব করিনি। দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে উঠল সেই উত্তাপ। গা-হাত-পা যেন ঝলসে যেতে লাগল গনগনে আগুনে। চারদিকে টগবগ করে ফুটতে লাগল জল। গন্ধকের উগ্রগন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল। এই প্রথম ভয়ের চিহ্ন দেখলাম কাকার মুখে। বুঝলাম, সাংঘাতিক বিপদের আর দেরী নেই।

মশালের ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল দেওয়াল ফুটি ফাটা হয়ে গেছে, ফাটল দিয়ে হু-হু করে বেরুচ্ছে গ্যাস। আর শোনা গেল, মেঘ গর্জনের মত বুক কাঁপানো ভয়াল গুরু গুরু শব্দ।

ফ্যাকাশে হাসি হেসে কাকা বললেন—"সুড়ঙ্গে অগ্ন্যুদগার শুরু হয়ে গেছে। অ্যাকজেল, লাভার স্রোতই আমাদের জ্বালামুখের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে।"

এত জোরে ভেলা উঠতে লাগল যে জ্বলন্ত তরল ধাতু স্রোতের ওপরে থাকা সত্ত্বেও আমরা ঝলসে কাবার হয়ে গেলাম না। চার পাশের দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গিয়ে আবার জুড়ে যেতে লাগল। সব ছাপিয়ে কানে তালা লাগার উপক্রম হল সেই গুরু-গুরু ভয়াবহ গর্জনে।

তারপর যে কি হল আর মনে নেই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে দেখছিলাম আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠেছে হ্যানসের সর্বশরীর।

পরক্ষণেই যেন তোপের মুখে মহাশূন্যে উড়ে গেল আমার দেহ!

।। পুরোনো পৃথিবী ।।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম পাহাড়ের গায়ে খাদের কিনারায় শুয়ে আমি। পাশে হ্যান্‌স্ আর কাকা। একটু দূরে পাঁচশ ফিট উঁচু একটা পর্বত শিখর থেকে গল গল করে বেরুচ্ছে ধোঁয়া তার ছাই। চার পাশের জমিও খুব কাঁপছে।

অনেক কষ্ট নীচে নেমে একটা বাচ্চা ছেলেকে জায়গাটার নাম জিজ্ঞেস করতে সে বললে 'স্ট্রম্বলি।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। কোথায় আইসল্যাণ্ডের স্নেফেল পাহাড়, আর কোথায় সিসিল এটনা আগ্নেয়পর্বত! মাঝখানে তিন হাজার মাইলের ব্যবধান!

কাকা হেঁকে উঠলেন—"কম্পাসটা আগে ফেলে দে, আগাগোড়া ভুল পথ দেখিয়েছে।"

মাসছয়েক পরে হামবুর্গের সেই ছোট্ট বাড়ীটায় হঠাৎ দেখলাম কম্পাসটা উল্টো দিকে মুখ করে রয়েছে!

কাকাকে বলতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন, "ঠিক ধরেছিস। পাতাল সমুদ্রে আমাদের ভেলায় একটা ইলেকট্রিক বল ফেটেছিল মনে আছে? সেদিনই সব চুম্বক হয়ে যায়—কম্পাসও বিগড়োয়।"

আমার চোখের সামনে তখন ভেসে উঠল সেই বিশাল উত্তাল সমুদ্র আর শূন্যে আশ্চর্য ভৌতিক দ্যুতি!

সম্পূর্ণ উপন্যাসটি গ্রন্থকারে দাম ২'৫০ (সডাক ৩'৩০)
"আশ্চর্য!" দপ্তরে অগ্রিম পাঠালে পাবেন।

এস্ এফ সিনে ক্লাবের টুকরো খবর

সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের উদ্যোগে এ বছরের দ্বিতীয় ফিল্ম প্রদর্শনীতে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ফ্যাবুলাস ওয়ার্ল্ড অফ জুল্স ভর্ণ নামে যে বিখ্যাত ফিল্মখানি দেখানো হয়, সেটিতে ক্লাবে এ যাবৎ প্রদর্শিত অন্যান্য ফিল্ম অপেক্ষা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রধান হল মিসটিমেশন পদ্ধতি যা এই ফিল্মটিতেই প্রথম প্রয়োগ করা হয়েছে। অদ্ভুত ধরনের সচল ডানাওয়ালা ডুবো জাহাজ এবং উড়ন্ত মানুষ, জলতলে অদ্ভুত মোটর সাইকেল চালনা এবং প্যাডেলচালিত মজাদার উড়ন্ত কল ছবির পর্দায় বিস্ময়করভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অনেকের ধারণা ছিল ডিসনী পদ্ধতির কার্টুনে তোলা হয়েছে ছবিটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল, মিসটিমেশন পদ্ধতি কার্টুন অপেক্ষা উন্নততর একটি চিত্রগ্রহণ কৌশল। সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের সদস্যগণ এই আধুনিকতম ফিল্ম টেকনিকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রচুর আনন্দলাভ করেছেন। অ্যাকাডেমি অভ ফাইন আর্টস হলে প্রদর্শিত এই ফিল্মে বিপুল সদস্য সমাগম হয়েছিল।

*

পাহাড়ী সান্যাল সাড়ে ছটায় এসে হাজির। এসেই এক হাঁক—"অদ্রীশ কোথায় ?"

সেক্রেটারী ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।—"কি ব্যাপার পাহাড়ীদা ?"

"তোমার সঙ্গে দেনা পাওনাটা আগে চুকিয়ে নেওয়া যাক। এ বছর কত দিতে হবে ?"

"ক্লাবের মেম্বারশিপ রিনিউয়াল ছটাকা আর 'আশ্চর্য!'র রিনিউয়াল সাবস-ক্রিপশন বারো টাকা।"

"কেন ? আমি যদি ছ টাকার বদলে একেবারেই চব্বিশ টাকা দিই ?"

"আমাদের তো চাঁদা বছরে ছটাকা, তিন মাসে নয়।"

"ও। চেক দেব, না, ক্যাশ ?"

বলেই হাতের মস্ত চৌকোনো বাক্সটা খুললেন পাহাড়ীদা।

*

সাতটা বাজতে দশ মিনিটের সময়ে টেলিফোন এল প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছ থেকে। যে গাড়ীতে তাঁর সপরিবারে আসার কথা, সে গাড়ী এখনও পৌঁছোয়

নি। উনি ট্যাক্সিতে আসছেন। কিন্তু দশ মিনিটের জন্যে যেন শো পিছিয়ে দেওয়া হয়। কারণ ক্যারেল জেমান পরিচালিত এই বিশেষ ছবিটির নির্মাণ কৌশল তিনি গোড়া থেকেই দেখতে চান। শ্রদ্ধেয় ভাইস প্রেসিডেন্টের নির্দেশে তাই সাতটা দশ মিনিটেই ছবি শুরু হল। এবং দশ মিনিট দেরী হওয়ার জন্যে সদস্যদের দিক থেকেও কোনো অসন্তোষ, আপত্তি বা অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটল না। সেদিনের প্রদর্শনীতে উপস্থিত ক্লাবের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বতস্ফূর্তভাবে সহিষ্ণু সদস্যদের সুনিয়মপ্রিয় আচরণের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা একথাও বলেছেন, অন্যান্য সংগঠনে এই বিলম্বের জন্যেও যে চাপা গুঞ্জন শোনা যায় প্রেক্ষাগৃহে, সেদিন তাও শোনা যায় নি। যদিও সদস্যরা তখনও জানতেন না দেরী হওয়াটা অযথা নয়, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধেয় ভাইস-প্রেসিডেন্টের নির্দেশ। প্রদর্শনীর মাঝখানে যান্ত্রিক গোলযোগে বেশ কয়েক মিনিট নির্বাক ছবি চলতে থাকে, কিন্তু শহরের গর্ব এস্ এফ সিনে ক্লাবের সদস্যদের প্রশংসনীয় আচরণ গুণে এতটুকু বিশৃংখল কোলাহল হয়নি সে সময়ে।

*

ফুটবলের প্রাঙ্গণ থেকে অবসর নিয়েছেন বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ প্রদীপ ব্যানার্জী—কিন্তু ক্লাবের প্রাঙ্গণ তাঁকে আকর্ষণ করেছে চুম্বকের মত। ফুটবলকে যেমন তিনি ভালবাসেন, তেমনি ভালবাসেন সায়ান্স-ফিকশ্যনকে। 'আশ্চর্য!' তাঁর প্রিয় মাসিকপত্র এবং এস্ এফ সিনে ক্লাবের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। সেদিনের ছবি দেখেও তিনি ভূয়সী প্রশংসা করে গেলেন সত্যজিৎ রায়ের নির্বাচনের। ১৯৬৬ সালে প্রদর্শিত চেক-ছবি "দি ম্যান ফ্রম দি ফার্স্ট সেঞ্চুরী"র চাইতে এই চেক ছবিটি নির্মাণ কৌশলের দিক দিয়ে অনেক বেশী উন্নত।

ছবিখানা দেখে অনেকে মন্তব্য করেছেন, খুব পুরনো মতো আবছা। মনে রাখতে হবে, ছবির কাহিনীটা প্রায় শত বর্ষ পুরনো এবং সেই পুরনো দিনের মেজাজ সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রচনার জন্যে ফিল্মটিতে ঐ টেকনিক অনুসরণ করা হয়েছে।

*

১৪ই মে হিচককের বিখ্যাত ফ্যানটাসী ফিল্ম্ "দি বার্ডস্" দেখানো হবে এয়ারকণ্ডিশনড্ হলে। ছবিটি সম্পর্কে বহু চিত্তাকর্ষক খবর শীগগিরই 'আশ্চর্য!' পত্রিকায় বেরুবে। স্থান: ম্যাজেস্টিক টকীজ। সময়: সকাল।

*

টড্ডাও (৭০ মিলিমিটার) ফিল্ম প্রদর্শনীর জন্যে জ্যোতি সিনেমা এস্ এফ সিনে ক্লাবকে দেওয়ার প্রস্তাব জানিয়েছেন শ্রীমানসাটা। প্রসঙ্গত, জিরো ডিগ্রী প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা আমেরিকা বাদে পৃথিবীতে মাত্র আর চারটি প্রেক্ষাগৃহে আছে। একটি লণ্ডনে, দুটি জাপানে এবং চতুর্থটি কলকাতায় জ্যোতি সিনেমায়। এই ব্যবস্থায় পর্দায় প্রক্ষেপিত ছবিতে এতটুকু বিকৃতি দেখা যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেরা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে বহু যত্নে জ্যোতি সিনেমা পুনর্নির্মাণ করেছেন শ্রীমানসাটা। এই সিনেমায় শব্দ-ব্যবস্থা এত নিখুঁত যে যিনি শুনেছেন, তিনি আর ভুলতে পারেন না। তাছাড়া বিশাল পর্দায় প্রক্ষেপণের দরুণ একই ছবি জ্যোতি সিনেমায় দেখে যতখানি উপভোগ করা যায়, ততখানি অন্য হলে হয় না। শ্রীমানসাটা সেক্রেটারী অদ্রীশ বর্ধনকে সঙ্গে করে নিয়ে সমস্ত কিছু ঘুরিয়ে দেখান এবং বুঝিয়ে দেন। লাইট হাউস মিনিয়েচার হলের মত জ্যোতি সিনেমাতেও একটি মিনিয়েচার প্রেক্ষাগৃহ তৈরী হচ্ছে। পঁচিশটি আসনের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে। আসনের সামনে মৃদু আলো সহ লেখবার আয়োজন আছে। পাশেই আছে খাবারের কাউণ্টার। এয়ারকণ্ডিশনড এই হলে ৭০ মিলিমিটার বাদে ৮, ১৬ এবং ৩৫ মিলিমিটারের সবরকম ছবি দেখানোর এবং আলোচনাদির ব্যবস্থা হচ্ছে। সেক্রেটারীর অনুরোধে শ্রীমানসাটা জানান, ক্লাবের জন্য হল ভাড়া কম করার প্রসঙ্গ তিনি বিবেচনা করবেন।

*

"ফ্যানটাসটিক ভয়েজ" ছবিটি বিলেতের সায়ান্স-ফিকশন মহলে সাড়া জাগিয়েছে। ছবিটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এ সংখ্যায় প্রকাশিত হল। ফিল্মটি কলকাতায় গ্লোব সিনেমায় মুক্তি লাভ করবে এবং প্রথম প্রদর্শনী পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হবে ক্লাব সদস্যদের জন্য। ছবিটি রঙীন, সিনেমাস্কোপ এবং জমজমাট।

*

এচ. জি. ওয়েলসের বিশ্ববিখ্যাত ধ্রুপদী সায়ান্স-ফিকশন উপন্যাস "ওয়ার অভ দি ওয়ার্ল্ড্‌স্" অবশেষে সায়ান্স-ফিকশন সিনে ক্লাবে আসছে। ছবিটি বেশ কিছু বছর আগে কলকাতায় হয়ে গেছে। বছরখানেক আগে একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রিণ্ট আসে প্যারামাউণ্ট পিকচার্সে। শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায়ের ইচ্ছা ছিল, এই ফিল্ম দিয়েই ক্লাবের উদ্বোধন হোক। কিন্তু তখন প্রিণ্ট পাওয়া যায় নি। প্রিণ্ট যখন এল, তখন প্যারামাউণ্টের কলকাতা অফিসের ম্যানেজার শ্রীপরমেশ্বরন

নানা অছিলায় গড়িমসি করতে লাগলেন এবং একবার স্পষ্টই জানালেন ছবিটা আগে ক্লাবে দেখালে সদস্যরা আর কমার্সিয়াল হাউসে গিয়ে দেখবেন না। তাতে ব্যবসায়িক ক্ষতি। বৃথাই তাঁকে বোঝানো হল সে এস্ এফ সিনে ক্লাবের উদ্দেশ্যই হল ফিল্মরসিকদের মধ্যে সায়ান্স-ফিকশন ফিল্ম সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি করা এবং ক্লাবে প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত হওয়ার সম্মান লাভের পর পরোক্ষভাবে পরিবেশক লাভবান হয়। কেননা, কাগজে কাগজে খবর সমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশ তো পায়ই, সায়ান্স-ফিকশন ফিল্ম ভক্তদের মুখে মুখে ছবির সুনাম সমাজের বুদ্ধিজীবি মহলে ছড়িয়ে পড়ে—যে প্রচারের মূল্য টাকা পয়সার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায় না।

কিন্তু শ্রীপরমেশ্বরন প্রচারবিদ নন। কাজেই এই সূক্ষ্ম অথচ মোক্ষম ব্যবসায়িক কৌশলটুকু তাঁর অবহেলাই পেল। ফলে, যা হবার, তাই হল।

ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায় বোম্বাইতে চিঠি লিখে এলিট সিনেমায় ওয়ার অভ দি ওয়ার্ল্ড্‌স মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রদর্শনী পুরোপুরি ক্লাব সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করলেন—তাও নাম মাত্র দক্ষিণায়।

কিন্তু খবরটি শ্রীপরমেশ্বরনের কানে পৌঁছোনো মাত্র তিনি বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং বোধ করি তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপে ফিল্মটি এলিট সিনেমায় মুক্তি পেল না।

ক্লাব সম্পাদক হাল ছাড়লেন না। সমানে লেগে রইলেন এবং কয়েক মাস আগে খবর পাওয়া গেল শ্রীপরমেশ্বরন ছবিটি হাওড়ার অলকা সিনেমায় প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন। সেখান থেকে টকিশো হাউসে আসবে।

তৎক্ষণাৎ শ্রীপরমেশ্বরনকে জানানো হল অলকায় মুক্তিলাভ করলে যত ভালো ছবি হোক না কেন, "ওয়ার অভ দি ওয়ার্ল্ড্‌স" নির্ঘাৎ মার খাবে। কেননা, ফিল্মটি প্রেসশো তো পাবেই না। কাগজে কাগজে সমালোচনাও বেরুবে না। উপরন্তু অলকা সিনেমায় এস্ এফ সিনে ক্লাবের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে না। ফলে, ছবিটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শ্রীপরমেশ্বরন কর্ণপাত করলেন না। ১লা ফেব্রুয়ারী অলকায় ফিল্মটি মুক্তি করল এবং মাত্র তিন দিন চলল। কোন দিনই হাউস ফুল হল না। টনক নড়ল শ্রীপরমেশ্বরনের। যে কোন তারিখে এখন ক্লাবে ফিল্মটি দিতে প্রস্তাব জানিয়েছেন তিনি। ১৫ই আগষ্ট জনতা অথবা ম্যাজেষ্টিক টকীজে ছবিটি দেখানোর আয়োজন চলছে।

সবশেষে বলে রাখা দরকার, এম-জি-এম প্রমুখ বিভিন্ন বিদেশী ফিল্ম পরি-

লেখকের কাছ থেকে প্রথম থেকেই পরিপূর্ণ সহযোগিতা পেয়ে এসেছে এস্ এফ সিনে ক্লাব।

*

"ওয়ার অভ দি ওয়ার্ল্ডস"-এর প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস-এর সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাক্রমে "গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ" পকেট বইখানি জলের দামে সদস্যদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার আয়োজন হয়েছে। ফিল্ম দেখার আগে কাহিনী যাঁরা পড়তে চান, তাঁরা এই সুযোগ নিশ্চয় হারাবেন না। সুশোভিত সচিত্র বইখানি মাত্র তিরিশ পয়সার বিনিময়ে (নগদ অথবা ৪০প. ডাকটিকিট) পাওয়া যাচ্ছে ক্লাব দপ্তর থেকে।

*

একটি অভাবনীয় সুসংবাদ। সত্যজিৎ রায় এবার সায়ান্স-ফিকশ্যন ফিল্ম তোলার কাজ পাকাপাকি করে এনেছেন। টাকা আসছে বিদেশ থেকে। কিন্তু ছবি উঠছে বাংলা দেশে বাংলা ভাষায়। একজন শুধু খ্যাতনামা আমেরিকান অভিনেতা থাকবেন ভূমিকালিপিতে। কাহিনী, পরিচালনা, সঙ্গীত সত্যজিৎ রায়ের। চিত্রনাট্যের যুগ্ম রচয়িতা হবেন সত্যজিৎ রায় এবং বিশ্ববিখ্যাত সায়ান্স-ফিকশ্যন কাহিনীকার কলিঙ্গ পুরস্কারবিজয়ী আর্থার সি ক্লার্ক। মিঃ ক্লার্ক সত্যজিৎবাবুর গল্পটি নিয়ে উপন্যাসাকারে লিখবেন এবং বিলেত থেকে প্রকাশ করবেন।

ছবির নামকরণও হয়ে গেছে। যথাসময়ে তা প্রকাশ পাবে।

সংবাদটি আনন্দের সন্দেহ নেই। আর গর্বের এই কারণে যে প্রস্তাবটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিদেশ থেকে সত্যজিৎবাবুর কাছে এসেছে এবং ৩নং লেক টেম্পল রোডে সত্যজিৎবাবুর বাড়ীতে বিদেশ থেকে কর্মকর্তারা ছুটে এসেছেন তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে। চিঠিখানা ক্লাব সম্পাদক অদ্রীশ বর্ধনকে সত্যজিৎ বাবু দেখান। একজন বাঙালী ফিল্ম ডিরেক্টরের প্রতি খ্যাতনামা কয়েকজন বিদেশীর শ্রদ্ধা ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে সে চিঠিতে।

বিষয়টি সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ সত্যজিৎবাবুর কাছ থেকে নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে এবং যথাসময়ে তা 'আশ্চর্য!' তে প্রকাশ পাবে।

বাংলা চিত্রনাট্যটিও 'আশ্চর্য !' তে প্রকাশের সম্ভাবনা আছে।

প্রসঙ্গতঃ কয়েকমাস আগে 'আশ্চর্য !' পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম খবর বেরিয়েছিল সত্যজিৎবাবু সায়ান্স-ফিকশ্যন ছবির গল্প শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ডি বানশাল এক্সপেরিমেণ্টের মধ্যে যেতে অনিচ্ছুক হওয়ায় আর কথাবার্তা এগোয় নি। তারপরেও সত্যজিৎবাবু হলিউড থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন—কিন্তু ইংরেজী ভাষায় ছবি তুলতে হবে বলে রাজী হন নি।

এক্সপেরিমেণ্ট এবারেও করছেন সত্যজিৎবাবু। কিন্তু তাঁর ঝুঁকি নিচ্ছেন বিদেশী প্রতিষ্ঠান।

*

শ্রী আর ডি বানশাল ফ্যানটাসি ফিল্মের ক্ষেত্রেও পেছিয়ে গেছেন। 'গোপী গায়েন বাঘা বায়েন' এর সমস্ত আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, সেট সেটিংএর তাড়াতাড়া ছবি এঁকে ফেলেছেন সত্যজিৎবাবু, দলবল নিয়ে রাজস্থানে গিয়ে শুটিংয়ের জায়গাও দেখে এসেছেন,—তখন শ্রীবানশাল চাইলেন ছবিটা হিন্দীতেও তোলা হোক। তাহলে ঝুঁকি কমবে। সত্যজিৎবাবু রাজী হলেন না। তখন শ্রীবানশাল শুটিং পেছিয়ে দিতে চাইলেন। কেননা, এক্ষুণি এই এক্সপেরিমেণ্ট করা ঠিক হবে না। সত্যজিৎবাবু বললেন—"নাউ অর নেভার। কেননা, আর সাতদিনের মধ্যে কাজ শুরু না করলে রাজস্থানে প্রচণ্ড গরম পড়ে যাবে।" শ্রীবানশাল তখন পেছিয়ে গেলেন।

সত্যজিৎবাবু পরে বললেন অদ্রীশ বর্ধনকে—"এ ছবির মার্কেট নেই, তা আমি মনে করি না। রূপকথা ছোট বড় সবারই ভাল লাগে। বিশেষ আমি যে ভাবে এ ছবি তুলবো, তা পৃথিবীতে এই প্রথম বলেই আমি জানি। ছবিটা শহরতলীতেও খুব নাম করবে। যাই হোক, এত যখন এগিয়েছি, তখন আর পেছোবো না। এ ছবি আমি তুলবোই।"

এবং সে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। শ্রীবানশাল পেছিয়ে যাওয়ার সাতদিনের মধ্যেই!

ছবিটার শুটিং আরম্ভ হবে আগামী শীতে—জানুয়ারী মাসে। তবে এবার আর শ্রী আর ডি বানশাল সঙ্গে থাকছেন না।

কে আছেন? সে সংবাদ জানানোর সময় এখনো হয় নি।

*

যে সায়-ফি ছায়াছবির ওপর ভরসা ছিল···

ফারেনহাইট ৪৫১

সমালোচনার সম্মুখীন···

ফরাসী পরিচালক ত্রুফোর "ফারেনহাইট ৪৫১" সায়ান্স-ফিকশ্যন ফিল্মখানি প্রস্তুতির খবর ইতিপূর্বে আমরা প্রকাশ করেছি। ওটি এখন বিদেশে দেখানো চলছে, সমালোচকদের নানা ধরনের অভিমতও এসে পৌঁচচ্ছে, ব্রিটিশ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটের চিত্র-সমালোচক সম্প্রতি ফিল্মখানি সম্পর্কে যে রায় দিয়েছেন, তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "রে ব্র্যাডবেরীর গল্পটাকে টেনে লম্বা করে নাটকীয় সূত্র অতিক্রম করে ফরাসী পরিচালক ত্রুফো "ফারেনহাইট ৪৫১" ফিল্মখানির মধ্যে ঘটনার অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি করে, ব্যয়সাধ্য রঙ ফলিয়ে, যা করেছেন, তাতে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি ; ছবির সব অংশে গল্পে পাওয়া যায় না।"

জগতের সবচেয়ে প্রাচীন ফিল্ম্ ফেসটিভ্যাল হয়ে থাকে প্রতি বছর ভেনিসে। গত বছর সেখানে ত্রুফোর "ফারেনহাইট ৪৫১" ফিল্ম্খানি দেখানোর জন্যে মনোনীত হয়েছিল। উৎসবে উপস্থিত অন্যতম চিত্র সমালোচক পিটার বেকারও ছবিখানি দেখে নিরাশ হয়ে বলেছেন, "যে সমাজ-জগতে বই লেখা বেআইনী, বই আগুনে পুড়িয়ে ফেলে দমকল বাহিনীর লোকেরা, রে ব্র্যাডবেরী রচিত তারই সায়-ফি কাহিনী নিয়ে ফিলম তুলতে গিয়ে ত্রুফো এক নাগাড়ে প্রচুর খেটেছেন, বহু ঝঞ্ঝাট সয়েছেন ; তবে বেশ মনে হয়েছে ছবিতে গল্প ফোটাতে হয় একথাটা তিনি সম্ভবতঃ কোনোদিন শোনেননি। নতুন চিন্তাকে ছড়িয়ে দিতে হলে ছাপা হরফের চেয়ে সিনেমার ক্ষমতা যে অনেক বেশি, একথা ব্র্যাডবেরীর গল্প নিয়ে তোলা এই ফিল্ম্খানির ক্ষেত্রে একেবারে মার খেয়েছে।"

সমালোচক পিটার বেকার 'ফারেনহাইট ৪৫১' সম্পর্কে আরও বলেছেন, "চিত্রনাট্য হয়েছে অগোছালো, কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তকে মাটি করা হয়েছে, আর শুধু শেষ ক'টা মিনিটে দেখেছি ছবি যেন একটা প্রলয়ঙ্কর চিন্তাকে ঠেলে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে। শেষ দৃশ্যপর্যায়ে যখন কয়েকজনকে নির্বাসন দেওয়া হলো এবং বলতে গেলে তারা বেঁচে রইলো শুধুই কথা-বলা বই হয়ে, অর্থাৎ নির্বাসিত নির্বাচিত ঐ কয়েকটি নরনারী সেরা কতকগুলি বই একেবারে কণ্ঠস্থ করে নিজেদের লুকিয়ে ফেললো, সে দৃশ্য সত্যি মর্মস্পর্শী। যে-বৃদ্ধটি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর স্মৃতিশক্তি থেকে ছোট্ট ছেলেটিকে যেভাবে একখানি বইএর বিষয়বস্তু বলে দিয়ে অর্পণ করে যাবার করুণ আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, তাঁর মধ্য দিয়ে হৃদয়-দোলানো অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। কিন্তু ত্রুফোর দমকল বাহিনীর লোকগুলো হয়েছে যেন চাবি দেওয়া কলের সেপাই—ত্রুফো নিশ্চয়ই এরকম করতে চাননি।"

পুস্তক পরিচয়

ঘনাদা নিত্য নতুন ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ ॥ দাম ৩·২৫ ॥

ঘনশ্যাম দাস আজ বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে পরিচিত। কনাল ডয়াল সৃষ্ট শার্লক হোমসের দৌলতে লণ্ডন শহরের ২২১ বি ঠিকানা যেমন সারা পৃথিবীতে প্রচারিত, প্রেমেন্দ্র মিত্র সৃষ্ট ঘনাদার দৌলতে বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ীটি তেমনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে বাঙালীদের কাছে। ঘনাদা আজ শুধু গল্পের খাঁচাতেই বন্দী নেই, বাস্তব জীবনেও নেমে এসেছেন। তাই আমরা নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে গল্পবাজ মানুষ দেখলেই বলি—এইরে ঘনাদা এসেছেন!

ঘনাদার আশ্চর্য সত্য তথ্যসম্বলিত অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার কখনো বাড়ন্ত হয় না। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর চারটি রুদ্ধশ্বাসী গল্পের সংকলন। "জল," "চোখ", "ছাতা", আর "ঘনাদা কুলপি খান না!" প্রতিটি গল্পের মধ্যে ঘনাদা সারা বিশ্বের এত রকম চমকপ্রদ খবর শুনিয়েছেন, এত জ্ঞানবিজ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়েছেন যে অবাক হয়ে যেতে হয় তাঁর সত্যের প্রতি নিষ্ঠা দেখে—আজগুবী গল্প বলতে বসেও।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন অজিত গুপ্ত। অঙ্গসজ্জা আকর্ষণীয় হয়নি। পাঁচটি পাতা ভরা রঙীন ছবি দেখেও গল্পের মেজাজ আসে না।

The Star Fox—Poul Anderson. প্রকাশক Gollancz. ১৮ শিলিং।

এ্যানডারসনের গল্পের নায়ক Gunnar Heim, অন্য নাম Star Fox, আন্তর্জাতিক রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন, এ্যাডভেনচারে পরিপূর্ণ সে কাহিনী। Aleriona র বাসিন্দারা পৃথিবীর বাসিন্দাদের বন্দী করে রেখেছে, তাই নিয়ে গল্প। বইখানিতে উত্তেজনা আর তৎপরতার চেয়েও বেশি একটা কিছু আছে। কারণ এ্যানডারসন জানেন কিভাবে গল্পের চরিত্রগুলিকে গভীর মর্যাদা দিতে হয়, কিভাবে নীতিগত সংকটকে গল্পে রূপায়িত করতে হয়। তারই ফলে উপন্যাসটি যেমন বুদ্ধিদীপ্ত, তেমনি চাঞ্চল্যকর হয়ে উঠেছে।

The Watch Below—James White. প্রকাশক Whiting and Wheaton. ১৮ শিলিং।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে একটি জাহাজ টর্পেডো আক্রান্ত হওয়ায় ফলে সবশুদ্ধ ডুবে যায়। কয়েকজন মাত্র রক্ষা পায়, হ্যাঁ বিস্ময়করভাবে রক্ষা পেয়ে বেঁচে থাকে সেই ডুবে-যাওয়া জাহাজটির মধ্যে—জলের তলায়! সেই জাহাজ এখনো জলের তলায়—ভেসে ওঠার কোন উপায় নেই। কয়েক যুগ কেটে গেছে, ভিন গ্রহ থেকে প্রাণীরা পৃথিবীতে বেড়াতে এসে তাদের দেখা পায়—ঠিক তেমনি সংকটে পড়ে। জলতলে আবদ্ধ সেই কটি মানুষের বংশধররা তখন তাদের দেখিয়ে দেয় কেমন করে জীবন ধারণ করতে হয়। একখানা নতুন স্বাদের উপন্যাস, চমৎকার ভাবে বলা হয়েছে, উৎকণ্ঠায় ভরা আগাগোড়া।

The Garden on the Moon—Pierre Boule. প্রকাশক Secker and Warburg. ২৫ শিলিং।

একদিন একজন বিনম্র জাপানী ভদ্রলোক এসে আমেরিকা এবং রাশিয়ার উদ্যোগে চাঁদে যাওয়ার কাণ্ড কারখানা দেখে বিস্ময়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন, বিপুল উদ্যোগ দেখে চমৎকৃত হলেন। যখন রাশিয়া এবং আমেরিকা রকেট ছাড়লো চাঁদের পথে, তখন মনে হলো আর কেউ যেন সেই অভিযানের আগে ভাগেই এগিয়ে চলেছে। ঠিক তাই—সেই জাপানী লোকটি। ভারী মজার শ্লেষাত্মক এবং প্রহসনমূলক উপাদানে ভরপুর উপন্যাসটি।

অগ্রগতিকেই প্রধান কারণ বলা যায়। একটা বোতাম টিপেই যখন সুদূর প্রান্তরের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হলো তখন এক সঙ্গে জড়ো হয়ে থাকার প্রয়োজনও লোপ পেল। শহরের অপমৃত্যুও ঘটল সঙ্গে সঙ্গে। আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে জয় করার ফলে পরিবহণ সমস্যার স্থায়ী এবং সহজ সমাধান হলো। আসবাব-পত্র মায় বড় বড় বাড়ীঘর প্রভৃতি সমস্ত কিছু অনায়াসে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হলো। ভৌগোলিক বাধা এখন আর কোন বাধাই নয়। "দূরত্ব" কথাটা শুধু নক্ষত্রলোকে সীমাবদ্ধ রইল। সুতরাং এবার বুঝতে পারছ যে পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে গেল মানুষের কাছে। মানুষ ইচ্ছামত স্থানে বাস করতে সুরু করলো। আর এর ফলে শহরের প্রয়োজন গেল ফুরিয়ে।"

বহ্নি চুপ করে রইল। একটা মৌমাছি ওদের আশেপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। এই মৌমাছির পূর্বপুরুষও হয়তো বহ্নিদের মতো পৃথিবী থেকে এসেছে। বহ্নি নিঃশব্দে মৌমাছির দিকে চেয়ে রইল। কয়েকটা বুনো ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে ব্যস্ত মৌমাছিটা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মধু সংগ্রহের ব্যর্থতায় দূরে উড়ে গেল।

"আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় আলোর চেয়েও দ্রুত গতিবেগ আমরা আয়ত্ত করতে পারব?" খাপছাড়া এক প্রশ্ন করল বহ্নি।

হেসে ফেলল বহ্নি। বহ্নির মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। আলোর গতিকে জয় করতে পারলে পৃথিবী আর নন্দনের মধ্যে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারা যেত। এ আশা শুধু বহ্নির নয়, সমস্ত নন্দন-বাসীর। সমস্ত মানবজাতি প্রকৃতিকে জয় করতে ব্যস্ত। প্রকৃতির অনেক কিছুই এখনও অপরাজিত। আলোর গতিবেগ এখনও অনায়ত্ত।

"হ্যাঁ, বহ্নি। আমি বিশ্বাস করি আলোর গতিবেগ জয় করার কৌশলে আবিষ্কার হবেই হবে। ইতিমধ্যে হয়তো কেউ এই অসাধ্য সাধন করে ফেলতেও পারে।"

"উঃ কি মজা হত তাহলে! যখন-তখন পৃথিবীতে যাতায়াত করা যেত। কত নতুন নতুন খবর জানতে পারা যেত।"—আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল বহ্নি।

নিলয় মাথা নাড়ল। "খুব ভাল কথা বলেছো, বহ্নি। কিন্তু পৃথিবীর খবর তো তোমাদের পাওয়া উচিত। কেন যে পাওনি সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে। প্রত্যেক উপনিবেশেই তো আমরা রোবট পাঠিয়েছি। রোবটের মধ্যে থাকে পৃথিবীর আধুনিক খবরা-খবর। কাজ শেষে এই রোবটগুলোই উপনিবেশের সংবাদ নিয়ে ফেরে পৃথিবীতে। রোবট পৃথিবীতে পৌছানমাত্র উপনিবেশের সমস্ত অভাব অভিযোগের সমাধান করা হয়। এই রকম করে আন্তঃনক্ষত্রের মধ্যে যোগাযোগ রাখি আমরা। পৃথিবী এখন প্রধান সংবাদ আদান প্রদান কেন্দ্র মাত্র। নন্দনের রোবট সংবাদদাতা যদি পথের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে থাকে তবে ইতিমধ্যে আরও একটা রোবট নিশ্চয় নন্দন অভিমুখে যাত্রা সুরু করেছে। শুধু ২৫।৩০ বছর ব্যবধান হবে তুটো রোবটের মধ্যে।"

বহ্নি অবাক হয়ে শুনলো রোবট সংবাদদাতার কাজ। তাঁতের মাকুর মতো পৃথিবী আর গ্রহগুলির মধ্যে যাতায়াত করে এই রোবটগুলো। কিন্তু নন্দনের ভাগ্য খারাপ। নয়তো নন্দনের রোবট হারিয়ে যাবে কেন। বর্তমানে নিলয়রা এই রোবটের কাজ করল। ভাবনার সূত্রগুলো যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী আর নক্ষত্রের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরত্ব ক্রমশঃ কমে আসছে। একদিন আসবে যখন ....

* * তিন সপ্তাহের মধ্যে নিলয়রা শক্ত ধাতুর এক উঁচু পিরামিডের মতো ঘর তৈরী করল। ঘরের মধ্যে রইল বিশাল বিশাল জটিল যন্ত্রপাতি।

অন্যান্যদের সঙ্গে বহ্নিও গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগল নিলয়দের। পিরামিডের এক মাইলের মধ্যে কাউকে যেতে

দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই নিষেধই বঙ্কিদের কৌতূহলী করে তুলেছে।

নিলয় আর কয়েকজন এখনও পিরামিডের মধ্যে রয়েছে। বঙ্কির ভীষণ ভয় যদি নিলয়ের কোন ক্ষতি হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে নিলয়রা বেরিয়ে এল। তারপর এক রকম দৌড়ে কাছের একটা পাহাড়ের ওপর উঠে পড়ল।

মুহূর্তের মধ্যে মাইলখানেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য এক প্রচণ্ড ঝড় যেন বয়ে গেল সেখানে। কিন্তু কী আশ্চর্য! শুধু মাত্র কয়েক শো গজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল সেই ঝড়। পাহাড়ের মতো বড় বড় ঢেউগুলো উঠছে আর পড়ছে। ঢেউয়ের সংঘর্ষে লক্ষ লক্ষ জলকণা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বঙ্কির মনে হল যেন এক বিরাট অদৃশ্য হাত সমুদ্রের তলায় প্রচণ্ড বেগে নাড়া দিচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত দৃশ্য পাল্টে গেল। বিরাট গোলাকারে ঢেউগুলো ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করল। অকস্মাৎ তার মধ্য থেকে এক বিশাল জলস্তম্ভ আকাশের দিকে উঠতে আরম্ভ করলো। জল-স্তম্ভের শীর্ষভাগ ক্রমশঃ সরু হচ্ছে। চারিদিকে জলরাশি প্রচণ্ড গর্জনে ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগলো।

এই দৃশ্যে সকলের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। কেউ কেউ ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। কেউ বা কানে হাত চাপা দিল। নির্ভয়ে বঙ্কি তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে।

ক্রমে জলস্তম্ভের তীক্ষ্ণ শীর্ষভাগ নীল আকাশের বুক স্পর্শ করলো। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল শীর্ষভাগ। আকাশ থেকে সহস্র ধারায় বৃষ্টিপাত সুরু হল। অস্বাভাবিক বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটাগুলো।

সমস্ত কৌতূহলের অবসান হলো। পৃথিবীর লোকেরা সফল হয়েছে তাদের পরীক্ষায়। আস্তে আস্তে ভীড় ফাঁকা হয়ে গেল।

হাজার বছরের চেষ্টায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে জয় করেছে মানুষ। চোখের সামনে যা ঘটে গেল সত্যি তা বিস্ময়কর। বিস্ময় শব্দটার অর্থ অনেক প্রসারিত হয়েছে। নক্ষত্রলোকে যাত্রা অবিশ্বাস্য ছিল এককালে। কিন্তু এখন! প্রচণ্ডগতিতে তারার জাহাজ ছুটে চলেছে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে।

নন্দনের সমুদ্রজল এতক্ষণে দেবযানের কাছে পৌঁছে গেছে। সেখানে হয়তো আর এক প্রচণ্ড শক্তিতে জল জমিয়ে বরফের শীল্ড তৈরী হচ্ছে। আর কয়েক দিনের মধ্যে শীল্ড তৈরী হয়ে যাবে। দেবযান আবার যাত্রা সুরু করবে নির্দিষ্ট নক্ষত্রলোকে।

বহ্নি খুব হতাশ হলো। মনে মনে কামনা করত নিলয়রা যেন বিফল হয় পরীক্ষায়। সফল হওয়ার একটা মাত্র অর্থ আছে বহ্নির কাছে। এবার ছেড়ে দিতে হবে নিলয়কে।

মনের সমস্ত ভাবনা চিন্তা গোপন রেখে সামনের দিকে এগিয়ে গেল বহ্নি। ওকে আসতে দেখে নিলয়ও দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। সাফল্যের আনন্দে নিলয়ের চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু বহ্নির দিকে তাকাতে সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল নিলয়ের।

"শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছি আমরা,"—থেমে থেমে বলল নিলয়।

"হ্যাঁ তাতো দেখলাম আর কতদিন আছ তোমরা?"

নিলয় মাথা নিচু করে একমনে পা দিয়ে বালি খুঁড়তে লাগলো। কি বলবে বহ্নিকে? জানা কথা বলার মধ্যে যে এত সমস্যা থাকতে পারে সে কথা কে ভেবেছিল আগে?

"চার পাঁচ দিন মাত্র বাকী আছে।"

কথাগুলো নিজের মনে মনে উচ্চারণ করল বহ্নি। এ তো নতুন সংবাদ নয় তার কাছে। এটাই তো স্বাভাবিক। আকাশকুসুম রচনা করেছিল বহ্নি। কিন্তু আকাশকুসুম যে আকাশকুসুম— বাস্তবে যে তার কোন অস্তিত্ব নেই একথাটাই ভুলে গিয়েছিলো সে।

"না না, তুমি যেতে পারবে না। তুমি চলে যেও না নিলয়।

চলে যেও না"—স্থান কাল পাত্র ভুলে চীৎকার করে উঠল বহ্নি।

বহ্নির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল নিলয়। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল—"তা হয় না, বহ্নি। নন্দন আমার পৃথিবী নয়। এখানে আমি খাপ খাওয়াতে পারবো না নিজেকে। নতুনত্বের অভাবে হয়তো মাসখানেকের মধ্যে বিষময় হয়ে উঠবে আমার জীবন।"

"তাহলে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।"

"কি বলছ তুমি, বহ্নি?"

"ঠিক বলছি আমি। অবাক হবার কিছু নেই। আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

"তুমি এখনও স্বপ্নের মধ্যে রয়েছো। তুমি একথাটা কেন বুঝতে পারছ না যে আমি যেমন এখানে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবো না, ঠিক তেমনি অবস্থা হবে তোমার।"

"সব শিখে নোব আমি। অনেক কাজ করতে পরেবো আমি। আমাকে তুমি এইখানে থাকতে বলো না, নিলয়।" অবরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ল বহ্নি।

নিলয়ের দুহাত সজোরে জড়িয়ে ধরল। জলভরা চোখ দুটো নীরব অনুনয়ে তাকিয়ে রইল নিলয়ের দিকে। বাক্যহারা হয়ে গেল নিলয়। দুজনের নীরব দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অব্যক্ত বেদনার ছাপ। নিলয় অনুভব করল বহ্নির অবস্থা। আর ঠিক সেই সময়ে তার বিবেক বাধা দিল প্রচণ্ডভাবে। ক্ষণিকের মোহে এত বড় ভুল কর না, নিলয়।

কিন্তু নিলয় তো বহ্নিকে আঘাত করতে চায় নি। সে সত্যি ভালবাসে বহ্নিকে। বহ্নিকে কোনদিনও ভুলতে পারবে না সে। সারাজীবন সে বহ্নির মঙ্গল কামনা করবে। কিন্তু ভালবাসা আর সমস্ত জীবন এক সঙ্গে কাটানোর মধ্যে বুঝি পার্থক্য অনেক। না, না, এ হবার নয়। এ হতে পারে না!

আর এগোনো উচিত নয়। শেষ করে দিতে হবে সমস্ত কিছু। প্রচণ্ড আঘাত পাবে বহ্নি। কিন্তু এছাড়া আর পথ কি?

"তোমার অনেক কিছু দেখার বাকী আছে এখনও। আমার সঙ্গে এস তুমি।"—বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল নিলয়।

নিঃশব্দে বহ্নি নিলয়কে অনুসরণ করল। এখানে সেখানে নানান্ যন্ত্রপাতি ছড়ানো। কয়েকজন বড় বড় যন্ত্র প্যাক্ করার কাজে ব্যস্ত। অনেক যন্ত্র ওরা নিয়ে যাবে না। নন্দনের উন্নতির জন্য দিয়ে যাবে ওগুলোকে। সামনের পাম গাছের নিচে কয়েকটা এ্যাণ্টী গ্র্যাভিটি স্কুটার দাঁড়িয়ে আছে। মেশিন বন্ধ অবস্থায় স্কুটারগুলো মাটি থেকে কয়েক ফুট ওপরে ভাসছে।

নিলয় কিন্তু ওগুলোর কাছে গেল না। একটু দূরে ডিম্বাকৃতি স্পেশশীপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

"এস, বহ্নি। আমরা এবার দেবযানে যাব!" স্পেশশীপের ওপর হাত ধরে টেনে তুললো নিলয়।

এক অদ্ভুত অচেনা জগতের মধ্যে এসে পড়ল বহ্নি। এরকম জটিল যন্ত্রপাতির মধ্যে নন্দনের বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও বোধহয় দিশেহারা হয়ে পড়বে।

বহ্নির একবার নন্দনের শাসনকর্তাকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেটা আর কিছুই নয়। বিরাট জটিল এক ইলেক্ট্রোনিক কম্পিউটার মাত্র। কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু এর কাছে কম্পিউটার যেন নেহাৎ ছেলেমানুষ।

নিলয় কণ্ট্রোল বোর্ডের সামনে বসে পড়ল। হাত দিয়ে বোর্ডের দুটো বোতাম টিপে দিল।

স্বচ্ছ দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে নন্দনকে দূরে সরে যেতে দেখল বহ্নি। ভেতরে কোন শব্দ বা ঝাঁকুনি নেই। নন্দন ছাড়িয়ে অনেক দূর উঠে এসেছে ওরা। নন্দনের চেপ্টা দিগবলয় রেখা দেখা যাচ্ছে।

সমুদ্রকে কাল চাদরের আস্তরণ বলে মনে হয়। প্রতি সেকেণ্ডে নন্দন ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হচ্ছে।

আকাশের দিকে তাকাল বহ্নি। তারার জাহাজ দেবযানকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট দেখাচ্ছে দেবযানকে। দেবযানের দুপাশে অনেকগুলো পোর্ট হোলের মত গর্ত দেখা যাচ্ছে।

পরমুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পারল বহ্নি। ওগুলো পোর্ট হোল নয়। ফেরীর মতো যে সব স্পেশশীপগুলো নন্দনে যাতায়াত করছে সেইগুলো ঐ গর্ত দিয়ে ঢুকছে তারার জাহাজের মধ্যে। ওদের স্পেশশীপটাও দেবযানের ভেতরে ঢুকে পড়ল। নিলয়ের সঙ্গে স্পেশশীপের বাইরে বেরিয়ে এল বহ্নি। বায়ুনিবোধক দরজা খুলে যেতেই ওরা দেবযানের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বহ্নি অবাক হয়ে দেখল এক বিরাট গোলাকার নলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। যতদূর দৃষ্টি যায় সোজা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওরা যায় ওপর দাঁড়িয়ে ছিল সেটাই আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করল। ক্রমে গতিবেগ দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো। বহ্নি কিন্তু কোন ঝাঁকুনি বা অসুবিধে বোধ করল না। কনভেয়র বেল্ট ওদের নিয়ে চলল দেবযানের অভ্যন্তরে!

দেবযানের অভ্যন্তরে মাইলখানেক চলে এল নিলয় আর বহ্নি। তবে এতটা পথ একভাবে আসেনি। কিছুটা কনভেয়র বেল্ট, করিডোর আবার কিছু পথ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিহীন লম্বা টিউবের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে ওদের। দেবযানের বিশালত্ব সম্বন্ধে, এখন কিছুটা আঁচ করতে পারল বহ্নি। ছোটখাটো এক কৃত্রিম জগৎ যেন। এই কৃত্রিম জগতই সভ্যতার বীজ নিয়ে যাচ্ছে অজানা নক্ষত্রে।

ইঞ্জিন রুমটা প্রায় আধ মাইল লম্বা। অনেকগুলো বৃহদাকার যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সামনের ব্যালকনির উপর বহ্নিকে দাঁড়াতে বলল নিলয়। নিচে অনেকগুলো নানান আকারের যন্ত্রের দিকে হাত

দেখিয়ে বলল—"এ সমস্ত আমাকে দেখাশোনা করতে হয়।" বহ্নি কোন কথা না বলে একবার তাকাল ওর দিকে।

নিলয় বহ্নিকে দেবযানের আরও অভ্যন্তরে নিয়ে চলল। অসংখ্য যন্ত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মেশিন, গুদামজাত নানান প্রয়োজনীয় জিনিষে ঠাসা দেবযান। নতুন নক্ষত্রে মানব সভ্যতার বিকাশে এগুলোর প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এখানে ওরা নন্দনের একদল বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ পেল।

তাদের পূর্বপুরুষরাও কি এত সাজসরঞ্জাম এনেছিল নন্দনে? ভাবল বহ্নি। না, এত তারা আনতে পারে নি। অনেক ছোট ছিল ওদের তারার জাহাজ। কিন্তু এখনও! এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আন্তঃ নক্ষত্র উপনিবেশ স্থাপনের কলাকৌশলের অনেক উন্নতি হয়েছে। তাই এখন এক ক্ষুদ্র জগত বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে।

একটা তুষারশুভ্র সাদা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল নিলয়। দরজাটা আপনা আপনি যেন খুলে গেল ওদের সামনে। ভেতরে লম্বা লম্বা কয়েকটা ধাপ দেখা যাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে বহ্নি বুঝতে পারল যে এটা একটা ক্লোকরুম ছাড়া আর কিছু নয়। সামনে অস্বচ্ছ স্ফটিকে দেওয়াল। নিলয়ের অভিপ্রায় এখনও বুঝতে পারল না বহ্নি। এবার আর কি দেখাতে চায় ওকে? অকস্মাৎ নিলয়ের গম্ভীর স্বরে চমকে উঠল বহ্নি।

"এবার আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে দেবযানের কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণশক্তির রেশমাত্র নেই। তাই আমার খুব কাছে থাকতে হবে তোমাকে।"

ভোজবাজির মতো সামনের স্ফটিকের দেওয়ালটা ওপর দিকে উঠে গেল। এক ঝলক বরফ হাওয়া ঝাপটা মারল বহ্নিকে। উঃ কী প্রচণ্ড ঠাণ্ডা! বহ্নির আশেপাশে তুষার জমতে সুরু করল। নিজেদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসগুলো চোখের সামনে জমাট বেঁধে নৃত্য সুরু করে দিল।

"এবার এর মধ্যে নিচে নাবতে হবে নাকি?" নিলয়কে প্রশ্ন করল বহ্নি।

বহ্নির হাতটা পরম স্নেহে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল নিলয়। বলল—"ভয়ের কিছু নেই, বহ্নি। কয়েক সেকেণ্ড পরে আর ঠাণ্ডা লাগবে না। আমি তো তোমার সঙ্গে আছি।"

বহ্নি কয়েক মুহূর্ত ইতঃস্তুতঃ করে নিচে নাবার জন্যে পা বাড়াল। কিন্তু নিচে নাবতে পারল না। 'নিচে' কথাটার কোন অর্থ নেই এখানে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাবে উপর নিচ বলে কোন কিছু নেই এই ঘরের মধ্যে। সুতরাং বহ্নি আর নিলয় এই তুষারশুভ্র হিমশীতল কক্ষে ভারশূন্য অবস্থায় ভেসে বেড়াতে লাগল।

অবাধ বিস্ময়ে চারিদিকে দেখতে লাগলো বহ্নি। চারিদিকে ছ' কোণা কাঁচের কয়েক শো ছোট ছোট কেবিন। ঠিক যেন এক বিরাট মৌচাক। কেবিনগুলো পরস্পরের সঙ্গে সরু পাইপ আর অজস্র তার দিয়ে জোড়া।

বহ্নি অবাক হয়ে দেখল যে প্রত্যেক ঘরে এক একজন করে মানুষ শুয়ে আছে। চারপাশে ঘুমন্ত মানুষের মেলা। এরাই বহ্নির বহুআকাঙ্খিত পৃথিবীর বাসিন্দা। সুদূর নক্ষত্রে এরাই এক নতুন সভ্যতার ইতিহাস লিখবে। যাত্রা শেষে ঘুম থেকে উঠে পৃথিবীর কথাই মনে হবে তাদের। তিন শতাব্দীর ঘুমে কী স্বপ্ন দেখবে এরা? মহাকাশের অসীমত্ব কী ধরা পড়বে এদের স্বপ্নে?

প্রতিটি কেবিনে একটি করে হ্যাণ্ডেল লাগান আছে। নিলয় হ্যাণ্ডেল ধরে কয়েকটি কেবিনকে পেছনের দিকে ঠেলে দিল। আর এই ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

নিলয় এবার একটি কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল। পাশেই আর একটা কেবিন খালি রয়েছে। অন্যান্য কেবিনের সঙ্গে এর কোন তফাৎ নেই। কিন্তু নিলয়ের মুখের দিকে তাকাতে সমস্ত পরিষ্কার

হয়ে গেল বহ্নির কাছে। এক নিমেষে নিঃস্ব হয়ে গেল বহ্নি। হৃৎপিণ্ডটা মনে হলো অব্যক্ত বেদনায় ফেটে যাচ্ছে।

স্বচ্ছ স্ফটিকের কেবিনের মধ্যে একটি মেয়ে ঘুমিয়ে আছে। অপরূপ সুন্দরী নয়। কিন্তু চোখে মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুপরিস্ফুট। শতাব্দীর ঘুমের মধ্যেও কোন পরিবর্তন হয়নি ওর। এই মেয়েটি যাত্রাশেষে নিলয়ের পাশে দাঁড়াবে। শক্তি, সাহস, উৎসাহ যোগাবে নিলয়কে। আর এদের যৌথ প্রচেষ্টায় মানব সভ্যতার বিজয় কেতন উড়বে নক্ষত্রলোকে।

বহুক্ষণ ধরে নিশ্চল অবস্থায় ভেসে রইল বহ্নি। অপলক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল তার ঘুমন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে। ঘুমন্ত মেয়েটি বহ্নির উপস্থিতি বুঝতে পারল না। সে জানল না যে সে বহ্নিকে হারিয়ে দিয়েছে। বহ্নি নিঃস্ব হয়ে গেছে এই ঘুমন্ত সাধারণ মেয়েটির কাছে। শীতের রং বেরঙের মৌসুমী ফুলগুলি যেন এক ঝলক সোনালী মিষ্টি স্বপ্ন নিয়ে ঝরে পড়ল রুক্ষ মাটির বুকে।

অবশেষে বহ্নিই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।

"ইনি তোমার স্ত্রী, তাই না নিলয়!"

নিলয় শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল বহ্নির দিকে। চোখের ভাষাই বাঙ্ময় হয়ে উঠল বহ্নির কাছে।

"তোমার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, বহ্নি। সম্পূর্ণ দোষ আমার আমি স্বীকার করছি।"

বহ্নি কোন কথা বলল না। আরও ঝুঁকে দেখতে লাগল ওর প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

"তোমার ছেলে মেয়ে নেই?"

"বর্তমানে নেই বলা যেতে পারে। তবে গন্তব্য স্থলে পৌঁছনোর ঠিক তিন মাস পরে জন্ম নেবে আমাদের প্রথম সন্তান।"

এত দুঃখের মধ্যেও বহ্নি অবাক হয়ে গেল নিলয়ের কথা শুনে। এ কী সম্ভব? তিনশ বছর নয় মাস পরে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে?

কিন্তু···যা, কিন্তুর কোন স্থান নেই এখানে। সব অসম্ভবকে সম্ভব করেছে এরা।

এই ঘরের কথা কোন দিনও ভুলতে পারবে না বহ্নি। হৃদয়ের রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা থাকবে আজকে সমস্ত ঘটনা।

আস্তে আস্তে ওরা বেরিয়ে এল হিমঘর থেকে। পেছনের স্ফটিকের দেওয়ালটা নিঃশব্দে নেবে এল। গরম হাওয়ার এক বিচিত্র শিহরণ লাগল সর্বাঙ্গে। কিন্তু বহ্নির হৃদয়ের হিমশীতলতা কোনদিনও মোছবার নয়।

আচ্ছন্ন অবস্থায় বহ্নি আবার ফিরে এল স্পেশশীপে। নিলয় কণ্ট্রোল বোর্ডের কয়েকটা বোতাম টিপে দিল।

"এবার আমাকে বিদায় দাও, বহ্নি। তোমাকে কোনদিনও ভুলবো না আমি।" নিজের হাতের মধ্যে বহ্নি অসাড় হাত তুলে নিল নিলয়। শেষ মুহূর্তে কী বলবে বহ্নি! কথার চেয়ে এই সরব নিস্তব্ধতা অনেক শ্রেয়। বহ্নির কাজল কাল চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠল। নিলয় আবছা গেল বহ্নির সামনে।

বহ্নিকে দু হাত দিয়ে সজোরে জড়িয়ে ধরল নিলয়। বহ্নির নিস্পন্দ ঠোঁটে উত্তপ্ত প্রেমের অজস্র স্বাক্ষর এঁকে দিল নিলয়। অসহ্য আবেগে থর থর করে কেঁপে উঠল বহ্নি। মহাশূন্যে এই ব্যর্থ প্রেমের সাক্ষী রইল কেবল দূরের আকাশের তারাগুলো।

সম্বিত ফিরতেই বহ্নি চেয়ে দেখল স্পেশশীপ শূন্য। নিলয়ের কোন চিহ্ন নেই কোনখানে।

কতক্ষণ কেটে গেল জানে না বহ্নি। অকস্মাৎ যান্ত্রিক স্বরে ঘোষিত হল—

"স্পেশশীপ ভূমি স্পর্শ করেছে। অনুগ্রহ করে বায়ুনিরোধক দরজা খুলে বাইরে যান।" সামনের ছোট দরজা খুলে গেল। যন্ত্রের মতো মতো বাইরে এসে দাঁড়াল বহ্নি।

ছোটখাটো ভীড় জমে গেছে স্পেশশীপের চারদিকে। উত্তেজনায়

থম্‌থম্‌ করছে সকলে। কোন কিছু বোঝার আগেই রজতের ক্রুদ্ধ চীৎকারে চমকে উঠল বহ্নি।

"কোথায় ? কোথায় নিলয় ? আর সহ্য করবো না আমরা !!"

একদৌড়ে স্পেশশীপে উঠে এল রজত। সজোরে হাত চেপে ধরল বহ্নির।

"সাহস থাকে তো বেরিয়ে আসতে বলো ওকে।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বহ্নি।

"সে এখানে নেই। সে আর কোনদিনও আসবে না এখানে ! আমি নিলয়কে……"

অব্যক্ত ব্যথায় সজোরে রজতকে জড়িয়ে ধরল বহ্নি। রজতের বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে গেছে। আবার সে ফিরে এসেছে রজতের কাছে।

॥ ৫ ॥

৫০ ঘণ্টা ধরে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে জলস্তম্ভ উঠতে লাগল মহাকাশে দেবযানের কাছে। সমুদ্র পারে এ কয় ঘণ্টা ভিড় জমে রইল সর্বক্ষণ অনেকে টেলিভিসন ক্যামেরা দিয়ে জল দিয়ে বরফের শীল্ডের ছবি তুলতে লাগল। শক্তিশালী ইলেক্‌-ট্রোনিক দুরবীণ দিয়ে বহ্নি নিজেও প্রত্যক্ষ করল এই অসাধ্য সাধন।

বন্দরের কাল হলো শেষ। আগামী কাল সূর্যাস্তের পরে আবার নক্ষত্রলোকে পাড়ি জমাবে দেবযান।

সমস্ত নন্দনবাসী গভীর দুঃখে অভিভূত হলো। পৃথিবীর মানুষদের বিদায় দিল তারা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। কামনা করল নিরঙ্কুশ হোক ওদের যাত্রাপথ।

সেদিনের রাত্রির নিস্তব্ধতা তীক্ষ্ণ শব্দে বিদীর্ণ হয়ে গেল। অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোয় ভেসে গেল নন্দনের মসীময় অন্ধকার। আকাশের গায়ে স্থির উজ্জ্বল নক্ষত্রটা হঠাৎ দ্রুত গতিতে উধাও হলো মহাশূন্যের বুকে।

অপলক দৃষ্টিতে বহ্নি নিলয়দের বিজয় অভিযান দেখল। বহ্নির হৃদয়ের একাংশ যেন জোর করে ছিঁড়ে নিয়ে গেল দেবযান। চোখের জল জোর করে বন্ধ করল বহ্নি। চোখের জল ফেলার তো অনেক সময় পড়ে রইল। চোখের জলে অমঙ্গল করবে না নিলয়ের যাত্রাপথ।

নিলয় কি ঘুমিয়ে পড়েছে? সে কী এখনও তাকিয়ে আছে ওর দিকে? বহ্নির কথা কি ভাবছে নিলয়?

রজতের আলিঙ্গনে বাস্তবে ফিরে এল বহ্নি। রজত তার আশ্রয় স্থল। এই তার যথার্থ স্থান। আর সে রজতকে ছেড়ে যাবে না! সুদূর নক্ষত্রলোকে তুমি স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখী হও। মানব সভ্যতার পত্তন কর সেখানে। কিন্তু আমার কথা কি মনে পড়বে না? তুমি কি ভুলে যাবে যাত্রাপথের দুশ বছরের আগের বহ্নিকে?

আকাশের দিকে তাকাল বহ্নি। আকাশ খালি। কোন চিহ্ন নেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের। অসংখ্য ছোট ছোট তারা ভরা আকাশ নিস্তব্ধ নিথর। কোন কোন তারা মিট্‌মিট্‌ করছে আবার কোনটা বা স্থির অচঞ্চল। আকাশ যেন হাজার চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বহ্নির দিকে। বোবা তারার চোখে ও কি জল পড়ে? স্তব্ধ আকাশ কি লাখো প্রদীপ জালিয়েছে বহ্নির মনের আঁধার দূর করার জন্যে? সমবেদনায় কি মুখর হয়ে উঠেছে নীরব আকাশ!

মনের আকাশে নিলয়কে কোনদিনও মুছে ফেলতে পারবে না বহ্নি। এই ভাল। নিলয় ভালই করেছে। বহ্নি স্থান নেই সেখানে। নিলয় তার সঙ্গীদের নিয়ে পাহাড় পর্বত সমতল করবে। সমুদ্র শাসন করবে। মানব সভ্যতার নতুন ইতিহাস লিখবে ওরা। সেখানে বহ্নির স্থান কোথায়? নন্দনের এই শান্ত সুন্দর পামগাছ ভরা বালির চড়াই অনেক আপন, অনেক ভালো তবুও আমৃত্যু বহ্নি নিলয়ের স্বপ্ন দেখবে।

নিলয়, তুমি শুধু মনে রেখো আমাকে। আর কিছু চাই না আমি। শুধু তোমার একটু স্বীকৃতি। তোমার হৃদয়ের সামান্যতম একটু স্থান যেন থাকে আমার জন্যে। তোমার বহ্নিকে তুমি ভুলে যেও না নিলয়। নিলয়! নিলয়!

***

Regd. C-118 ASCHORJO March 1967 Re 1·50

অদ্রীশ বর্ধন

রচিত ভালো ভালো বই

সমুদ্র শয়তান

বিস্ময়কর সোভিয়েত ছায়াছবির রহস্যঘন বৃহৎ উপন্যাস সদ্য প্রকাশিত,

২৪১ পৃঃ, বিচিত্র অভিনব মলাট, মাত্র চার টাকা

'বিস্ময়কর কাহিনী, পাঠকমনকে স্তব্ধ করে রাখে, পড়বার সময় সময় কোথাও থমকে দাঁড়াতে হবে না'—অমৃত

রোবার হলেন আকাশরাজা

'নিঃসন্দেহে পাঠকমহলে সাড়া জাগাতে পারবেন'—আনন্দবাজার

'কাহিনীটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। শ্রীবর্ধন যে সায়ান্স-ফিকশ্যন রচনায় বিশেষ পারঙ্গম, এই বইখানি তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন'—বসুমতী

'চুম্বকের মতো তরুণ মনকে নিবিষ্ট করে রাখবে'—অমৃত

মাত্র এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা

শার্লক হোমস ফিরে এলেন

বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ-রাজার ১৩টি উপন্যাসোপম বেস্টসেলার গল্পগ্রন্থ

৫২৭ পৃঃ, ৬৪ খানি ছবি, ২য় মুদ্রণ। দশ টাকা।

'প্রশংসনীয়'—আনন্দবাজার ।। 'আশ্চর্য'—অমৃত

অ্যালফা বিটা। ৭৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলকাতা-১৪